বাংলা সাহিত্যকে যে দু'জন মনীষী–কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুষমামন্ডিত ও কিরীটশোভিত করেছেন, তাদের লেখনীও সে পঙ্কিলতার স্পর্শমুক্ত হতে পারেনি। শরৎচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা বিষদুষ্ট লেখনীর উদ্ধৃতি আমরা উপরে দিয়েছি।

কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকেও যখন এ আবর্তে অবগাহন করতে দেখি তখন ক্ষোভে ও লজ্জায় স্বতঃই বেদনার্তকণ্ঠে মুসলমান বলে উঠে জুলিয়াস সীজারের মতো ঃ Et tu Brute। তোমাকে ত রবীন্দ্রনাথ,এসবের উর্ধ্বে ভেবেছিলাম। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ না করে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পটি ও 'শিবাজী উৎসব' কবিতা পাঠ করে দেখতে পাঠক সমাজকে অনুরোধ করি।

(আবদুল মওদূদ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৭১)।

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা যখন সাফল্যের শীর্ষে, তখন তারই সমসাময়িক একজন মুসলমান বাংলাসাহিত্য গগনে উদিত হন। তিনি হলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর সাহিত্য ছিল আলবৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যের অংগনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছিলেন, তখন মশাররফ হোসেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে শিল্পীসুলভ মনোভাব নিয়ে মুসলমানদের প্রতি উপদেশমূলক সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় তিনি সাহিত্য সাধনা করেন এবং উপন্যাস, জীবনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, নাটক, রম্যরচনা, কবিতা ও গান তাঁর সাহিত্য সাধনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা 'বিষাদসিন্ধু'। বিষাদসিন্ধুর চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত হলেও এটাকে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না। তথাপি মুসলমান সমাজে এটা ছিল সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গগনে আর একটি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে এবং তা হলো বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের অংগনে আরও অনেক মুসলিম কবি–সাহিত্যিকের আগমন সমসাময়িককালে হয়েছে। যথা– কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ। নিজেদের স্বতন্ত্র ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তাঁরা মুসলমান জাতিকে আত্মসচেতনায় ও স্বাতন্ত্রবোধে উদ্বুদ্ধ করেন। নজরুলের আগেও বাংলা সাহিত্যের আসরে বহু মুসলিম কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তাঁদের ও নজরুলের সাহিত্য ধারায় ছিল সুস্পষ্ট পার্থক্য। অন্যান্যগণ সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছেন, মনে হয়, ভীরু পদক্ষেপে, মনের দুর্বলতা সহকারে। বাংলা সাহিত্যকে হিন্দুর, সংস্কৃত–তনয়া মনে করে গা বাঁচিয়ে যেন তাতে ছোঁয়া না লাগে মুসলমানের আরবী–উর্দু–ফার্সীর শব্দাবলীর, এমনকি উপমায়, অলংকারে ও রচনারীতিতে মুসলমানী নিদর্শন–আলামতকে সতর্কতার সাথে বাঁচিয়ে চলেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের হঠাৎ আবির্ভাব যেমন সৃষ্টি

করলো বিস্ময়, তেমনি সূচনা করলো এক বৈপ্লবিক যুগের। যে মুসলমানের বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বোধনকৃত করে বেদ-পুরাণ ও হিন্দু-জাতিত্বমুখী করা হয়েছিল, নজরুল তার গতিমুখ ফিরিয়ে করলেন মুসলমানের কেবলামুখী। মানুষের তাজা খুনে লালে-লাল করা যুদ্ধের ময়দানে তিনি প্রবেশ করেছিলেন যেমন বীরবিক্রমে, তেমনি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে তীব্র গতিতে ও বীরবিক্রমেপ্রবেশকরলেন—সাহিত্যের ময়দানে। তাঁর মনে কোনদিন স্থান পায়নি দ্বিধাসংকোচ, তীরুতা ও কাপুরুষতা। তাই তিনি তাঁর বিজয় নিশান উড়াতে পেরেছিলেন সাহিত্যের ময়দানে। তিনি তৎকালীন মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের দ্বিধাসংকোচ ঘুঁচিয়ে দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমানসুলভ আযাদী এনে দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে আরবী-ফার্সীর ঝংকার পুনরায় শুনা যেতে থাকে। তাঁর আরবী-ফার্সী শব্দাবলীর ব্যবহার পদ্ধতি এত সুনিপুণ, সুশৃংখল ও প্রাণবন্ত যে, ভাষা পেয়েছে তার স্বচ্ছন্দ গতি, ছন্দ হয়েছে সাবলিল এবং সুরের ঝংকার হয়েছে সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি আধুনিক বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানী করে ভাষাকে শুধু সৌন্দর্যমন্ডিতই করেননি, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র ও নিজস্ব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা ভাষায় মুসলিম সাহিত্যসেবীদের জন্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দেন তিনি। কবি নজরুল ছিলেন কাব্য সাহিত্য জগতের এক অতি বিস্ময়। তাঁর এ প্রতিভা ছিল একান্ত খোদাপ্রদত্ত। তাঁর আবির্ভাব হয় ধূমকেতুর মতো এমন এক সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তাঁর সম্মানজনক আসন করে নিয়েছেন। বিপ্লবী কবি নজরুল-প্রতিভার স্বীকৃতি তাঁকে দিতে হয়েছে এ আশিষের ভাষায়—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু
দুর্দিনের ঐ দুর্গ শিরে-
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

নজরুলের কাব্য প্রতিভা যেমন তাঁকে সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছে সাহিত্য জগতের, তেমনি তাঁর বিপ্লবী কবিতা সুপ্ত মুসলিম মানসকে করেছে জাগ্রত, তাদের নতুন চলার পথে দিয়েছে অদম্য প্রেরণা ও প্রাণশক্তি। এতোদিন মুসলমানরা যে সাহিত্যক্ষেত্রে ছিল অপাংক্তেয় তাদের সে গ্লানি গেল কেটে। তাদের জড়তা গেল ভেঙে। জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো নতুন উৎসাহ উদ্যমে। নজরুল সুপ্ত মুসলিমকে এই বলে ডাক দিলেন—

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন ইসলামী লাল মশাল,
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণপ্রদীপ জ্বাল।

তাঁর এ আহবান ব্যর্থ যায়নি। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানের নতুন কাফেলা শুরু করলো যাত্রা অবিরাম গতিতে।

উনবিংশ শতকে মুসলমান

মুসলমান চরম অগ্নি পরীক্ষার মুখে

ইংরাজী ১৮০০ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল এবং তার পরেও কয়েক দশক ছিল মুসলমানদের জন্যে অগ্নিযুগ। বাংলার মুসলমান এ সময়ে জাতি হিসাবে এক অগ্নি গহ্বরের প্রান্তে অবস্থান করছিল। তাদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর তাদের অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল চরম বিপর্যয়। বিদেশী শাসক ও তাদের এতদ্দেশীয় অনুগ্রহপুষ্ট সহযোগীদের নির্যাতন নিষ্পেষণেও মুসলমান জাতি তাদের শাসন শোষণকে মেনে নিতে পারেনি। শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও খন্ডযুদ্ধের মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বহুবার এবং বহুস্থানে এই শতকের মধ্যে। ফকীর বিদ্রোহ, ফারায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন, সাইয়েদ আহমদের জেহাদ আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ ও হিন্দু কর্তৃক মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক ও পৈশাচিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিস্ফোরণ। এর এক একটির পৃথক পৃথক আলোচনাই এ অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু।

ফকীর আন্দোলন

ফকীর আন্দোলনের যতোটুকু ইতিহাস জানতে পারা যায়, তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, পলাশী যুদ্ধের পর এবং বিশেষ করে ১৭৬৪ সালে মীর কাসেমের পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া 'দেওয়ানী' লাভ ক'রে যখন তাদের অত্যাচারমূলক শাসন দন্ড চালাতে শুরু করে তার পর থেকে 'ফকীর বিদ্রোহ' শুরু হয় এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৩৩ অথবা ১৮৩৪ সালে। ফকীর বিদ্রোহের পশ্চাতে কোন মহান উদ্দেশ্য ছিল কিনা, এবং বিদ্রোহ পরিচালনার জন্যে কোন সুসংগঠিত ও সুশৃংখল বাহিনী ছিল কিনা, তা বলা মুস্কিল। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে যে ফকীর বিদ্রোহ হয়েছিল, তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল কিনা, তাও বলা কঠিন। তবে যে কারণে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তা হলো একাধারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট নতুন হিন্দু জমিদার, মহাজনদের অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন।

তাদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্ট ও আশ্রয়পুষ্ট শোষণকারী, জমিদারদের উচ্ছেদ করা ও তাদের অর্থাগার লুট করা। উত্তরবংগে এদের অভিযানের ফলে বহু জমিদার ইতিপূর্বেই (১৭৭৩) ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। (ময়মনসিংহে ফকীর অভিযান, খালেকদাদ চৌধুরী, ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত 'শতাব্দী পরিক্রমা', পৃঃ ২৬)।

ফকীর আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মজনু শাহ, মাজু শাহ, টিপু পাগল ও গজনফর তুর্কশাহ। খালেকদাদ চৌধুরী তাঁর ময়মনসিংহে ফকীর অভিযান প্রবন্ধে মজনু শাহ্‌কে মাজু শাহের বড়ো ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেন। ১৭৬৪ সালে মীর কাসেম আলীর পরাজয়ে . . . এ দেশে ইংরেজ অধিকার বদ্ধমূল হয়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ঐ একই সালে মজনুর (মজনু শাহ্) অনুচরদের হাতে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ('বিপ্লব আন্দোলনে দক্ষিণবংগের অবদান'—আজিজুর রহমান, হাসান জামান সম্পাদিত 'শতাব্দী পরিক্রমা', পৃঃ ১৮০)।

১৭৮৪ সালে মাজুশাহ ময়মনসিংহ, আলাপসিং, জাফরশাহী এবং শেরপুর পরগণার জমিদারদের সমস্ত ধনদৌলত লুণ্ঠন করে। সেখানে সংবাদ রটে যে, মাজু

শাহের ভাই মজনু শাহ দুইশ' দুর্ধর্ষ ফকীরসহ জাফরশাহী পরগণায় আসছেন। তাঁর এই অভিযানের ভয়ে জমিদার এবং প্রজারা অন্যত্র পালিয়ে যায়। কিন্তু ঢাকার চীফ্ মিঃ ডে-র রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বেগমবাড়ীর সৈন্যবাহিনীই সেই অভিযান প্রতিরোধ করে। ফলে ফকীরেরা ফিরে যায়। মিঃ ডে-র রিপোর্টে আরও উল্লেখ আছে যে, জমিদারদের ধন সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যাপারটি সত্য নয়। খাজনা ফাঁকি দেয়ার জন্যে সুচতুর ও অসাধু জমিদারেরা এরূপ মিথ্যা সংবাদ রেভেনিউ কমিটির কাছে পাঠিয়েছিল। (শতাব্দী পরিক্রমা, পৃঃ ২৭)।

পুনরায় ফকীর অভিযান শুরু হয় দু'বছর পর ১৭৮৬ সালে। ময়মনসিংহকে ফকীরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে লেফট্‌ন্যান্ট ফিল্ডকে ঢাকা পাঠানো হয়। ময়মনসিংহের কলেক্টর রাউটনের সাহায্যের জন্যে আসাম গোয়ালপাড়া থেকে ক্যাপ্টেন ক্রেটনকে পাঠানো হয়। সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্যদের সাথে ফকীরদের যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়, তাতে ফকীর বাহিনী পরাজিত হয়ে ছত্রভংগ হয়ে যায়। তারপর আর বহুদিন যাবত তাদের কোন তৎপরতার কথা জানা যায় না।

ফকীরদের অভিযান বন্ধ হওয়ার পর জমিদারগণ তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের নাম করে প্রজাদের নিকট থেকে বর্ধিত আকারে রাজস্ব আদায় করতে থাকে এবং নতুন কর ধার্য করতে থাকে। তাতে প্রজাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে।

প্রজাদের নির্যাতনের অবসানকল্পে ১৮২৬ সালে টিপু পাগল নামক জনৈক প্রভাবশালী ফকীর কৃষক প্রজাদের নিয়ে এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন। জমিদারেরা সকল ন্যায়নীতি ও ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন নং-৮ অগ্রাহ্য করে প্রজাদের উপর নানাবিধ 'আবওয়াব' ধার্য করতে থাকে। এসব আবওয়াব ও নতুন নতুন উৎপীড়নমূলক কর জবরদস্তি করে আদায় করা হতো। তাছাড়া জমিদারেরা আবার প্রতিপত্তিশালী লোকদের কাছে তাদের জমিদারী অস্থায়ীভাবে উচ্চমূল্যে ইজারা দিত। ইজারাদারেরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উৎপীড়নের মাধ্যমে প্রজাদের কাছ থেকে উচ্চহারে খাজনা আদায় করতো। এসব উৎপীড়ন বন্ধের জন্যে টিপু প্রজাদেরকে সংগঠিত করেন।

এসব অভিযানকারী ফকীরদেরকে ইতিহাসে অনেকে লুণ্ঠনকারী দস্যু বলে অভিহিত করেছেন। আসলে ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন জনগণের শ্রদ্ধেয় অলী-দরবেশ শ্রেণীর লোক।

সুসুজ পরগণার লেটীরকান্দা গ্রামের এক প্রভাবশালী ফকীরের মস্তান ছিলেন টিপু পাগল। তিনি একজন কামেল দরবেশ ছিলেন বলে সকলে বিশ্বাস করতো। বহু অলৌকিক কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে আজো প্রচলিত আছে এবং তাঁর মাজারে ওরস উপলক্ষে আজো বহু লোকের সমাগম হয় (খালেকদাদ চৌধুরী, শতাব্দী পরিক্রমা, পৃঃ ২৮–২৯)।

মানুষকে ধর্মকর্ম শিক্ষাদান করা এসব ফকীরের কাজ ছিল। কিন্তু জনসাধারণের চরম দুর্দশা দেখে তাঁদের অন্তরাত্ম কেঁদে উঠেছিল। তার ফলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁরা মাঝে মাঝে অভিযান চালিয়েছেন।

এসব ফকীরের দল অসভ্য বর্বর ছিল—তাও নয়। তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত ও রুচিবোধ সম্পন্ন। এমনকি টিপুর মাতার মধ্যেও ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক যোগ্যতা। টিপু ও তাঁর বাহিনীকে প্রেরণা যোগাতেন টিপু জননী। ১৮২৫ সালে টিপুর নেতৃত্বে ফকীর দল জমিদারদের খাজনা বন্ধের আন্দোলন করে। জমিদারদের বরকন্দাজ বাহিনী ও ফকীরদের মধ্যে এক সংঘর্ষে বরকন্দাজ বাহিনী নির্মূল হয়ে যায়। জমিদারগণ কোম্পানীর শরণাপন্ন হয়। কোম্পানী টিপু ও তাঁর সহকারী গজনফর তুর্কশাহকে বন্দী করার জন্যে একটি সশস্ত্র সেনাবাহিনী পাঠায়। একটি সেনাদল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু অপর একটি দল টিপুকে বন্দী করে। তুর্কশাহ তার দল নিয়ে কোম্পানীর সেই সেনাদলকে আক্রমণ করে টিপুকে মুক্ত করেন।

এ ঘটনার পর ম্যাজিষ্ট্রেট ডেম্পিয়ার একটি শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে শেরপুর আগমন করে। টিপু বাহিনীর সাথে প্রচন্ড যুদ্ধে টিপু তাঁর জননীসহ বন্দী হন।

পরবর্তীকালে ১৮৩৩ সালে টিপুর দু'জন শক্তিশালী সহকর্মীর নেতৃত্বে ফকীরদল পুনরায় সংঘবদ্ধ হয় এবং শেরপুর থানা আক্রমণ করে তা জ্বালিয়ে দেয়। তারপর ক্যাপ্টেন সীল ও লেফটন্যান্ট ইয়ংহাজবেন্ডের অধীনে একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হয় ফকীর বাহিনী দমন করার জন্যে। এক প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষে ফকীর বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভংগ হয়ে যায়।

উপরে ফকীর বিদ্রোহের কিছু বিবরণ দেয়া হলো। তবে ফকীরদের সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা ইংরেজ লেখক ও ইতিহাসকারদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁদেরকে বেদুইন

বলেছেন, আর হান্টার সাহেব বলেছেন 'ডাকাত'। তাঁদের আক্রমণ অভিযানে কয়েক দশক পর্যন্ত নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশরাজ এখানে টলটলায়মান হয়ে পড়েছিল, সম্ভবতঃ সেই আক্রোশেই তাদের ইতিহাস বিকৃত করে রচনা করা হয়েছে। উপরে মজনু শাহ ও মাজু শাহ্‌কে দুই ভাই বলা হয়েছে। এর সত্যাসত্য যাচাই করার কোন ঐতিহাসিক তথ্য বা উপাদান আমাদের কাছে নেই। তবে কেউ কেউ বলেছেন মজনু শাহ্ ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের মেওয়াত এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কানপুরের চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত মাকানপুরে অবস্থিত শাহ্ মাদারের দরগায় মজনু শাহ্ বাস করতেন। সেখান থেকেই হাজার হাজার সশস্ত্র অনুচরসহ তিনি বাংলা বিহারের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ ও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তাঁর কার্যক্ষেত্র বিহারের পুর্ণিয়া অঞ্চল এবং বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, রাজশাহী, মালদহ, পাবনা, ময়মনসিংহ ছিল বলে বলা হয়েছে।

১৭৭২ সালের প্রথমদিকে মজনু শাহ বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র অনুচরসহ উত্তর বংগে আবির্ভূত হন। তাঁর এ আবির্ভাবের কথা জানতে পারা যায় রাজশাহীর সুপারভাইজার কর্তৃক ১৭৭২ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে কোম্পানীর কাছে লিখিত এক পত্রে। তাতে বলা হয়, তিনশ' ফকীরের একটি দল আদায় করা খাজনার এক হাজার টাকা নিয়ে গেছে এবং আশংকা করা যাচ্ছে যে, তারা হয়তো পরগণা কাচারীই দখল করে বসবে। তলোয়ার, বর্শা, গাদাবন্দুক এবং হাউইবাজির হাতিয়ারে তারা সজ্জিত। কেউ কেউ বলে তাদের কাছে নাকি ঘূর্ণায়মান কামানও আছে। (স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ৩৩)।

১৭৭৬ সালে মজনু শাহ বগুড়া জেলার মহাস্থান আগমন করে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সে সময় বগুড়া জেলার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মিঃ গ্লাডউইন। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান। ১৭৮৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফকীর সর্দারকে (মজনু শাহ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে পর পর দু'টো সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়। . . . উভয় ক্ষেত্রেই ফকীরদের পক্ষে যেমন কিছু লোক হতাহত হয়, ইংরেজদেরও অনুরূপভাবে কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়। . . . ঐতিহাসিক তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, এরপর গঙ্গা পাড়ি দিয়ে মজনু শাহ দেশে চলে যান। আর কোন

দিন তাঁকে বাংলাদেশে দেখা যায়নি। আনুমানিক ১৭৮৭ সালে কানপুর জেলার মাখনপুর এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে সরকারী সূত্রে জানা যায়। তাঁর মৃতদেহ সেখান থেকে তাঁর জন্মভূমি মেওয়াতে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয় (স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ৪০–৪১)।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র পরাগ আলী, পালিত পুত্র চেরাগ আলী, অন্তরঙ্গ ভক্ত মুসা শাহ, সোবহান শাহ, শমশের শাহ প্রমুখ শিষ্যগণ অষ্টাদশ শতকের শেষতক ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

নবম অধ্যায়

ফারায়েজী আন্দোলন

ইংরেজরা পলাশী ক্ষেত্রে যুদ্ধের অভিনয় করে কূট কলাকৌশলে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে এবং ১৭৬৪ সালে মীর কাসেমকে পরাজিত করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনদন্ড লাভ করেই ক্ষান্ত হলো না। বরঞ্চ মুসলমান জাতি নির্মূল করার নতুন ফন্দি ফিকির খুঁজতে লাগলো। তাদের অদম্য অর্থলিপ্সা প্রজাপীড়নে তাদেরকে উন্মত্ত করলো। মুসলমানদের আয়মা, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হলো। মুসলমানদের হাত থেকে খাজনা আদায়ের ভার দেয়া হলো হিন্দুদের উপর। নতুন প্রভুকে তুষ্ট করার জন্যে তারা প্রজাদের উপরে শুরু করলো নির্মম শোষণ–পীড়ন। বিলাতী বস্ত্রের বাজার সৃষ্টির জন্যে তাঁতীদের নির্মূল করার (১৭৭০–১৮২৫) কাজ শুরু হলো। ১৭৬৬ সালে প্রতিমণ লবণের উপর দু'টাকা হারে কর ধার্য করে লবণ ব্যবসা ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকারে নেয়া হলো। এভাবে মুসলমানরা সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে লাগলো।

শুধু তাই নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনেও মুসলমানরা বাধাগ্রস্ত হতে লাগলো। অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় গো–কুরবানী এবং আজান দেয়া নিষিদ্ধ হলো। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান প্রজাদের দাড়ির উপরে ট্যাক্স ধার্য করলো। তাদের পূজাপার্বণে মুসলমানদেরকে চাঁদা দিতে, পূজার যোগান ও বেগার দিতে বাধ্য করা হলো। মুসলমানদেরকে ধূতি পরতে ও দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখতে বাধ্য করা হলো। মুসলমানদের ধর্ম, তাহজিব–তমদ্দুনকে ধ্বংস করে হিন্দুজাতির মধ্যে একাকার করে ফেলার এক সর্বনাশা পরিকল্পনা শুরু হলো। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে উঠলো দিশেহারা। বাংলার মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনের সময় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার বন্দর পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। আঠার বছর বয়সে তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। হজ্ব পালনের পর তিনি আঠার বছর সেখানেই অবস্থান করে ধর্ম, সমাজ বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং ইসলামী

জীবনদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভবতঃ তিনি এ সময়েই করেন। ইসলাম নিছক কতিপয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সমষ্টিই নয়, বরঞ্চ এ হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের পরিপূর্ণ অনুশাসন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পালন করে চলাও কিছুতেই সম্ভব নয় রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতিরেকে। এ তত্ত্বজ্ঞানও তিনি লাভ করেন। অতঃপর ১৮২০ সালে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

মক্কায় অবস্থানকালে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে এবং এ আন্দোলনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

দিল্লীতে শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভীর নেতৃত্বে ভারতভূমিতেও আবদুল ওহাব নজদীর অনুকরণে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়—ঐতিহাসিকগণ যার বিকৃত নাম দিয়েছেন 'ওহাবী আন্দোলন'। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করেন এবং 'দারুল হরব'কে 'দারুল ইসলাম' তথা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সক্রিয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী, শাহ আবদুল আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল ও জামাতা মাওলানা আবদুল হাই।

হাজী শরীয়তুল্লাহও এ দেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন এবং যতোদিন এ দেশ 'দারুল ইসলাম' না হয়েছে ততোদিন এখানে 'জুমা' ও ঈদের নামাজ সংগত নয় বলে ঘোষণা করেন। হিন্দুর পূজাপার্বণে কোন প্রকার আর্থিক অথবা দৈহিক সাহায্য-সহযোগিতা ইসলাম-বিরুদ্ধ (শিরক ও হারাম) বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, মুসলমানদেরকে ধূতি ছেড়ে তহবন্দ-পায়জামা পরিধান করতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে এবং সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে তওবা করতে হবে। মোটকথা যাবতীয় পাপকাজ পরিত্যাগ করে নতুনভাবে ইসলামী জীবন যাপন করতে হবে।

শোষিত-বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মুসলমান জনসাধারণ হাজী শরীয়তুল্লাহর আহবানে নতুন প্রাণসঞ্চরণ অনুভব করলো এবং দলে দলে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যে দশ বারো হাজার মুসলমান তাঁর দলভুক্ত হলো। এটা হলো হিন্দু জমিদারদের পক্ষে এক মহাআতংকের ব্যাপার। এখন মুসলমান নিষ্পেষণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং যেসব নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র মুসলমানদেরকে তারা তাদের দাসানুদাসে পরিণত করে ইসলাম ধর্ম থেকেও

দূরে নিক্ষেপ করেছে, তারাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব, তাদের উদ্বিগ্ন ও আতংকিত হয়ে উঠারই কথা। "The Zaminders were alarmed at the spread of the new creed which bound the Mussalman peasantry together as one man"— (Dr. James Wise; Journal of Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIII, 1894 No, 1)।

হাজী শরীয়তুল্লাকে দমন করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর হলো হিন্দু জমিদারগণ। তাঁদের দলে যোগ্দান করলো কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী আধা-মুসলমান যারা ছিল হিন্দু জমিদারদের দাসানুদাস। অদূরদর্শী মোল্লা-মৌলভী ও পীর, যারা মুসলমানদের মধ্যে শিরক বিদয়াত প্রভৃতি কুসংস্কারের নামে দু'পয়সা কামাই করছিল, তারাও ফারায়েজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো।

একদিকে ব্রিটিশ এবং অপরদিকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার মহাজনদের উপর্যুপরি অত্যাচার-নিষ্পেষণে মুসলমানরা অনন্যোপায় হয়ে মাথানত করে সবকিছু সহ্য করে যাচ্ছিল। শরীয়তুল্লাহর আহবানে নিপীড়িত মুসলমানগণ দলে দলে তাঁর কাছে এসে জমায়েত হতে লাগলো এবং ব্রিটিশ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করলো। সম্ভবতঃ 'ফরয' শব্দ থেকে ফারায়েজী (ফারায়েযী) আন্দোলনের উৎপত্তি। মুসলমান সমাজ ইসলামের ফরয কাজগুলি ভুলতে বসেছিল এবং বহু অনৈসলামী আচার-অনুষ্ঠানকে মুসলমান সমাজে প্রচলিত করেছিল। যাবতীয় ইসলাম বিরোধী রীতিনীতি পরিত্যাগ করে নবী মুহাম্মদের (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল আরবের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর প্রমুখ মনীষীদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনে হিন্দুস্বার্থে চরম আঘাত লেগেছিল বলে তারা ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় তাঁকে দমন করতে সকল শক্তি প্রয়োগ করলো। তৎকালীন হিন্দু সমাজের মনোভাব হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রতি কতখানি বিদ্বেষাত্মক ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৩৭ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একখানি পত্রে। পত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

ইদানিং জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুরপুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক একজন বাদশাহী লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক বার হাজার

জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নতুন এক শরা জারি করিয়া নিজ মতাবলম্বী লোকদিগের মুখে দাড়ি, কাছা খোলা, কটিদেশে ধর্মের রজ্জুভৈল করিয়া তৎচতুর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও হইয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে—এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মতলবগঞ্জ থানার রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটিতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্মরাশি করিলে একজন যবন মৃত হইয়া ঢাকায় দওরায় অর্পিত হইয়াছে। . . . আর শ্রুত হওয়া গেল, সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট যবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণী চরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেব-দেবী পূজায় আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু যবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুমতি বোধ করিয়া—ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কয়েকজন যবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয়, দুষ্ট যবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারগৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল, ফরিদপুরের ম্যাজিস্টেট সাহেবের হুজরে যে সকল আমলা ও মোক্তার-কারেরা নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই সরিতুল্লা যবনের মতাবলম্বী—তাহাদের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয়, তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ লোক দলবদ্ধ। ইহাতে ফরিয়াদীর সাক্ষীর ত্রুটি কি আছে. . . আমি বোধ করি, সরিতুল্লা যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার চোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমীর করিয়াছিল না। ইতি সন ১২৪৩ সাল, তারিখ ২৪শে চৈত্র।" ("সংবাদপত্রে সেকালের কথা"-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত—শতাব্দী পরিক্রমা, পৃঃ ১৯৪-৯৫)।

পত্রখানির প্রতিটি ছত্রে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের মানসিকতা পরিসফুট হয়েছে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে বাংলাদেশ থেকে বহু মুজাহিদ, যাকাত, ফেৎরা, লিল্লাহ থেকে সংগৃহীত বহু অর্থ এবং নানা প্রকার সাহায্য পশ্চিম ভারতের সিত্তানা কেন্দ্রে পাঠাতেন।

ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী নামক স্থানে প্রথমে শরীয়তুল্লাহর নতুন কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু হিন্দু জমিদারদের চরম বিরোধিতার ফলে তাঁকে আপন গ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রচারকার্য শুরু করতে হয়। তাঁর আন্দোলন ঢাকা, বরিশাল, নদিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করে। নিরক্ষর, চাষী, তাঁতী ও অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নামাজ-রোজার প্রচলন, ধুতির পরিবর্তে তহবন্দ-টুপির ব্যবহার, মসজিদগুলির সংস্কার প্রভৃতি কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে। হাজী শরীয়তুল্লাহ নিজে মাথায় প্রকান্ড পাগড়ী ও গায়ে জামার উপরে ছদরিয়া পরতেন—যে পোশাক সাধারণতঃ কোন মুসলমান ব্যবহার করতো না। ১৮৪০ সালে তিনি পরলোক গমন করার পর তাঁর যোগ্য পুত্র দুদু মিয়া তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ মুহসীন ওরফে দুদু মিয়া ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ সালে তিনি হজ্ব পালনের জন্যে মক্কা গমন করে পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর পিতার কাজে সাহায্য করেন।

পিতার ন্যায় দুদু মিয়াও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। জমিদারদের সংগে তাঁকে বার বার সংঘর্ষে আসতে হয়। ১৮৪২ সালে তিনি ফরিদপুরের জমিদার বাড়ী আক্রমণ করেন এবং মদন নারায়ণ ঘোষকে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। পুলিশ তাঁকেসহ ১১৭জন ফারায়েজীকে গ্রেফতার করে। বিচারে ২২ জনের কারাদন্ড হয়। কিন্তু দুদু মিয়াকে প্রমাণের অভাবে খালাস দেয়া হয়। ১৮৪৬ সালে এনড্রিও এন্ডারসন এর গোমস্তা কালি প্রসাদ মনিবের আদেশে সাত আটশ' লোক নিয়ে দুদু মিয়ার বাড়ী চড়াও করে এবং প্রায় দেড় লক্ষ মূল্যের অলংকারাদিসহ বহু ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েও কোন ফল হয় না।

জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়ে কোন সুবিচার না পেয়ে দুদু মিয়া এবার নিজ হাতে শত্রুদের উচিত শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। ১৮৪৬ সালের নভেম্বর মাসে, তাঁর গৃহ লুণ্ঠিত হওয়ার একমাস পরে, তিনি

শত্রুদের অত্যাচার-উৎপীড়নে ইন্ধন সংযোগকারী নীলকর ডানলপের কারখানা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে দেন এবং গোমস্তা কালী প্রসাদকে হত্যা করেন। দুই বৎসর পর্যন্ত মামলা চলার পর দুদু মিয়া তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান।

জনসাধারণের মধ্যে দুদু মিয়ার অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে সরকার বিব্রত হয়ে পড়েন। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন চলাকালে দুদু মিয়া উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন এই অজুহাতে তাঁকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। প্রথমে আলীপুরে এবং পরে তাঁকে ফরিদপুর জেলে রাখা হয়। ১৮৫৯ সালে মুক্তিলাভ করে তিনি ঢাকায় আসেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুদু মিয়া পিতার আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিলেন বটে। কিন্তু নীতির দিক দিয়ে তিনি পিতার আদর্শের কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ যে ছয়টি বিষয়ের উপরে তাঁর আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা হচ্ছে—

- o মুসলমান শাসিত দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও জুমা ও ঈদের নামায বৈধ নয়;
- o মহররমের পর্ব ও অনুষ্ঠান পালন ইসলাম বিরুদ্ধ এবং পাপকার্য;
- o 'পীর' ও 'মুরীদ' পরিভাষাদ্বয়ের স্থলে 'উস্তাদ' ও 'শাগরেদ' পরিভাষাদ্বয়ের ব্যবহার। কারণ 'মুরীদ' তার যথাসর্বস্ব 'পীরের' কাছে সমর্পণ করে যা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে 'শাগরেদকে' তা করতে হয় না।
- o এ আন্দোলনে যারাই যোগদান করবে তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, 'আশরাফ'-'আতরাফ'— কোন ভেদাভেদ থাকবে না। বরঞ্চ সকলের মধ্যে সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিতহবে—'পীরি-মুরীদির' মধ্যে যার অভাব দেখা যায়।
- o পীরপূজা ও কবরপূজা ইসলাম বিগর্হিত বলে এসবের তীব্র প্রতিবাদ জানান।
- o তৎকালে পীরের হাতে হাত রেখে 'বয়আত' করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তার পরিবর্তে 'ফারায়েজী' আন্দোলনে যোগদানকারী শুধুমাত্র সকল পাপ কাজ থেকে খাঁটি দিলে 'তওবা' করে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করার শপথ গ্রহণ করবে।
- o ধাত্রীকর্তৃক নব প্রসূত সন্তানের নাড়িকর্তনকেও ইসলাম বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, এ কাজ পিতার, বেগানা ধাত্রীর নয়।

জেমস টেইলার বলেন যে, কোরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই

ফারায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং কোরআন যেসব অনুষ্ঠানাদি সমর্থন করে না তা সবই বর্জনীয়। মহররমের অনুষ্ঠান পালনই শুধু নিষিদ্ধ নয়, এ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও নিষিদ্ধ। (Dr. A. R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal. p. 69)।

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে দুদু মিয়া সমগ্র পূর্ববাংলা কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক এলাকায় একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন যাদের কাজ ছিল আন্দোলনের দিকে মানুষকে আহবান করা, কর্মী সংগ্রহ করা ও সংগঠন পরিচালনার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা। এভাবে যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী হলো তার মাথায়, দুদু মিয়া, 'পীর' রূপে বিরাজমান হলেন যে পীরপ্রথাকে তাঁর পিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, pt. II, No. 1, 1894, p. 50; Encylopaedia of Islam, Vol. II. p-58)।

হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবদ্দশায় যে আন্দোলন পরিচালিত ছিল, তা ছিল মুখ্যতঃ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের প্ররোচনায় দু'একটি সংঘর্ষ ব্যতীত কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাঁর আন্দোলনের সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে আন্দোলন অনেকটা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। সকল জমিদার ও নীলকরগণ তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। তাই দুদু মিয়ার সারা জীবন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কেটে গেছে। একদিকে গরীব প্রজাদের উপর জমিদার-নীলকরদের নানাপ্রকার উৎপীড়ন এবং তাদের দুঃখ মোচনে দুদু মিয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তাদেরকে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করে। দুদু মিয়ার সাংগঠনিক যোগ্যতাও ছিল অসাধারণ। বাংলার জমিদারগণ ছিল প্রায়ই হিন্দু এবং নীলকরগণ ছিল ইংরেজ খৃষ্টান ও তাদের গোমস্তা কর্মচারী ছিল সবই হিন্দু। এ কারণেও কৃষক প্রজাগণ জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়েছিল। দুদু মিয়াকে সারা জীবন জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই কেটে গেছে। নিত্য নতুন মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় তাঁকে জড়িত করা হয়। এসবের জন্যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্য বরণ করতে হয়।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র যথাক্রমে গিয়াসউদ্দীন হায়দার ও নয়া মিয়া ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। নয়া মিয়ার মৃত্যুর পর দুদু মিয়ার তৃতীয় পুত্র আলাদীন আহমদ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি ১৯০৫ সালের বংগভংগ সমর্থনে নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে সহযোগিতা করেন। আলাদীনের পর তাঁর পুত্র বাদশাহ মিয়া আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২২ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এ সময়ে সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। তারপর ফারায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন নিয়ে এ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ যে জেহাদী প্রেরণা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে ক্রমশঃ অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়। যে পীর-মুরীদি হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনকে খাঁটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন, অবশেষে এ আন্দোলন সেই পীর-মুরীদিতেই রূপান্তরিত হয়ে গেল। ফলে এ আন্দোলনের মতাবলম্বীদের কার্যকলাপ ও কর্মপদ্ধতি থেকে পূর্বের সে জেহাদী প্রেরণা ও সংগ্রামী মনোভাব বিদায় গ্রহণ করলো।

দশম অধ্যায়

শহীদ তিতুমীর

শহীদ তিতুমীর সমসাময়িক একজন অতীব মজলুম ব্যক্তি। তিনিও হাজী শরীয়তুল্লাহর মতো অধঃপতিত মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর এ নিছক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে হিন্দু জমিদারগণ শুধু প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করেনি, ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমান জাতির প্রতি তাদের অন্ধ বিদ্বেষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতীব পরিতাপের বিষয় সমসাময়িক ইতিহাসে তিতুমীরের চরিত্র অত্যন্ত বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। তার কারণও অতি সুস্পষ্ট। বিদ্বেষপুষ্ট হিন্দুদের দ্বারা বর্ণিত বিবরণকে ভিত্তি করে ইংরেজ লেখকগণ তাঁর সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা বিকৃত, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিতুমীরের ন্যায় একজন নির্মল চরিত্রের খোদাপ্রেমিক মনীষীকে একজন দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত ও ডাকাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। ডাঃ এ আর মল্লিক তাঁর British Policy & the Muslims in Bengal গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায় Calcutta Review, Boards Collections, 54222, p-401, Colvin to Barwell, 8 March 1832 Para 6, Magistrate of Baraset to Commissioner of Circuit, 18 Div. 28 November, 1831, para 35 প্রভৃতির বরাত দিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন। বলা হয়েছে যে, তিতুমীর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, তবে মুন্সী আমীর নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত জোতদারের পরিবারে বিয়ে করেন। আরও বলা হয়েছে যে, তিতুমীর একজন দুশ্চরিত্র দুর্বৃত্ত বলে পরিচিত ছিলেন এবং নদিয়ার জনৈক হিন্দু জমিদারের অধীনে ভাড়াটিয়া গুন্ডা হিসাবে চাকুরী করেন। এ উক্তিগুলি সম্পূর্ণ সত্যের অপলাপ ব্যতীত কিছু নয়। এসব বিবরণ থেকে অথবা ইসলাম বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে হান্টার সাহেবও মন্তব্য করেন, "এ সময় কোলকাতায় ধর্মীয় নেতার যেসব শিষ্য-শাগরেদ ও অনুসারী ছিল, তাদের মধ্যে পেশাদার কুস্তিগীর ও গুন্ডা প্রকৃতির একটা লোক ছিল তিতুমিয়া নামে। এই ব্যক্তি এক সম্ভ্রান্ত কৃষকের পুত্র হিসাবে জীবন আরম্ভ করলেও জমিদারের ঘরে বিয়ে করে নিজের অবস্থার উন্নতি করেছিল। কিন্তু উগ্র

ও দুর্দান্ত চরিত্রের দরুন তার সে অবস্থা বহাল থাকেনি।" (W. W. Hunter: The Indian Mussalmans, B. D. First Edition, 1975, pp. 34-35)।

ইংরেজ খৃষ্টান হান্টার সাহেব মুসলিম জগতের চিরস্মরণীয় ও বরেণ্য মনীষী সাইয়েদ আহমদ শহীদ সম্পর্কেও জঘন্য উক্তি করেছেন। যথাস্থানে তার আলোচনা করা হবে। যতোটা নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে জানা গেছে, তারই ভিত্তিতেই তাঁর আন্দোলন ও কার্যতৎপরতার আলোচনা আমরা করব। তার ফলে আশা করি, এটাই প্রমাণিত হবে যে, তাঁর শিক্ষা, চরিত্র, খোদাপ্রেম, অসত্য ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামী মনোভাবের সাথে উপরের কল্পিত বর্ণনার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।

পলাশী যুদ্ধের পঁচিশ বছর পর এবং উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকের সমগ্র ভারতব্যাপী আযাদী সংগ্রামের (১৮৫৭) পঁচাত্তর বছর পূর্বে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর (সাইয়েদ) হাসান আলী এবং মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ১)।

ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ অবজ্ঞাভরে এবং তিতুমীরকে ছোটো করে দেখাবার জন্যে তাঁকে এক অনুল্লেখযোগ্য কৃষক পরিবার সম্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রখ্যাত সাইয়েদ বংশে জন্মলাভ করেন। প্রাচীনকালে যে সকল অলী-দরবেশ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন তাঁদের মধ্যে সাইয়েদ শাহ হাসান রাজী ও সাইয়েদ শাহ জালাল রাজীর নাম পুরাতন দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যায়। দুই সহোদর ভাই সাইয়েদ শাহ আব্বাস আলী ও সাইয়েদ শাহ শাহাদত আলী যথাক্রমে সাইয়েদ শাহ জালাল রাজী ও সাইয়েদ শাহ হাসান রাজীর মুরীদ ও খলিফা ছিলেন। সাইয়েদ শাহাদত আলীর পুত্র সাইয়েদ শাহ হাশমত আলীর ত্রিংশ অধস্তন পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। (শহীদ তিতুমীর, আদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৩-৪)।

তিতুমীর বিয়ে করেন তৎকালীন খ্যাতনামা দরবেশ শাহ সূফী মুহাম্মদ আসমতউল্লা সিদ্দিকীর পৌত্রী এবং শাহ সূফী মুহাম্মদ রহীমুল্লাহ সিদ্দিকীর কন্যা মায়মুনা খাতুন সিদ্দিকাকে। (ঐ ... পৃঃ ১৬)।

আবু জাফর বলেন, মীর নিসার আলীর পিতার নাম মীর হাসান আলী এবং মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। ... তিতুমীর বিয়ে করেন হযরত শাহ সূফী মুহাম্মদ রহীমুল্লা সিদ্দিকীর কন্যা মায়মুনা সিদ্দিকাকে। বিয়ের চৌদ্দ দিন পরে তাঁর ছোটো দাদা সাইয়েদ ওমর দারাজ রাজী প্রাণত্যাগ করেন। এর ছয় মাস পর তাঁর পিতা মীর হাসান আলীর মৃত্যু হয়। (স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ১১৭-১৮)। নিসার আলীর জন্মের আগেই তাঁর আপন দাদা সাইয়েদ শাহ কদমরসুল দেহত্যাগ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ ওমর দারাজ রাজীর হাতেই মুরীদ হন নিসার আলীর পিতা মীর হাসান আলী।

এসব তথ্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এক অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর ও তাঁকে একজন উচ্ছৃংখল দুষ্টপ্রকৃতির যুবক এবং জনৈক হিন্দু জমিদারের গুন্ডাবাহিনীর বেতনভুক সদস্য বলে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রগঠন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে উপরের মন্তব্য ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হবে।

তৎকালীন মুসলিম সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিসার আলীর বয়স যখন চার বছর চার মাস চার দিন, তখন তাঁর পিতামাতা পুত্রের হাতে তখ্‌তী দিয়ে তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা করেন। তারপর সেকালের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ মুন্সী লালমিয়াকে নিসার আলীর আরবী, ফার্সী ও উর্দুভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। মাতৃভাষা বাংলাভাষা শিক্ষার প্রতিও তাঁর পিতামাতা উদাসীন ছিলেন না মোটেই। সেজন্যে পার্শ্ববর্তী শেরপুর গ্রামের পন্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যকে বাংলা, ধারাপাত, অংক ইত্যাদি শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। এ সময়ে বিহার শরীফ থেকে হাফেজ নিয়ামতুল্লা নামে জনৈক পারদর্শী শিক্ষাবিদ চাঁদপুর গ্রামে আগমন করলে, গ্রামের অভিভাবকগণ তাঁকে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আঠার বছর বয়সে নিসার আলী শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং তিনি কোরআনের হাফেজ হন। উপরন্তু আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র, ফারায়েজ শাস্ত্র, হাদীস ও দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, তাসাওউফ, এবং আরবী-ফার্সী কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষ পান্ডিত্য লাভ করেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন।

যে যুগে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন, বাংলার কিশোর ও যুবকরা তখন নিয়মিত শরীরচর্চা করতো। চাঁদপুর ও হায়দারপুর গ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা প্রাঙ্গণটি ছিল শরীরচর্চার আখড়া। হায়দারপুর নিবাসী শেখ মুহাম্মদ হানিফ শরীরচর্চা শিক্ষা দিতেন। এ শরীরচর্চার আখড়ায় শিক্ষা দেয়া হতো ডনকুস্তী, হাডুডু খেলা, লাঠি খেলা, ঢালশড়কী খেলা, তরবারী ভাঁজা, তীর গুলতী, বাঁশের বন্দুক চালনা প্রভৃতি। হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ শুধু আরবী-ফার্সী অথবা কোরআন হাদীসেরই উস্তাদ ছিলেন না, তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে নানাবিধ খেলার কসরতও শিক্ষা দিতে থাকেন। প্রত্যহ বৈঠকে ও সন্ধ্যারাত্রিতে তিনি শরীরচর্চার ও অস্ত্রচালনার নানা প্রকার কৌশল শিক্ষা দিতে থাকেন। এ আখড়ার সর্দার ছাত্র হলেন দু'জন— শেখ মুহাম্মদ হানিফ ও সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

সম্ভবতঃ বিংশ শতকের প্রথম দশকেই তাঁর বিয়ে হয়। তার বছর দেড়েক পর তিনি উস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহর সাথে কোলকাতা এবং তালিবটোলায় (বর্তমান নাম তালতলা) হাফেজ মুহাম্মদ ইসরাইলের বাসায় অবস্থান করতে থাকেন। হাফেজ ইসরাইলও ছিলেন বিহার শরীফের অধিবাসী। তিনি তালতলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম নিযুক্ত হন—এখানেই বিয়ে করে কোলকাতাবাসী হয়ে যান। তালিবটোলা বা তালতলার একটি অংশকে তখন মিসরীগঞ্জ বলা হতো। এখানে কুস্তী প্রতিযোগিতার একটি আখড়া বা কেন্দ্র ছিল যার সভাপতি ছিলেন জামালউদ্দীন আফেন্দী। সে যুগে পেশাদারী কুস্তী প্রতিযোগিতার প্রচলন হয়নি। ধনবান ব্যক্তিগণ শারীরিক শক্তি ও বীরত্ব অর্জনে প্রেরণা দানের জন্যে বিজয়ী ব্যক্তিকে পুরস্কার ও খেলাৎ দান করতেন এবং পরাজিত ব্যক্তিকে শুধু পুরস্কার দিতেন। কুস্তীগিরি করে ধনউপার্জন করতে হবে, এ ধরনের মনোভাব তখন পালোয়ানদের মনে স্থান পায় নি।

তিতুমিয়ার কোলকাতা অবস্থানকালে মিসরীগঞ্জ আখড়ায় কুস্তী প্রতিযোগিতা হতো এবং বিজয়ী পালোয়ানকে প্রচুর এনাম দেয়া হতো। এখানে কুস্তী প্রতিযোগিতায় তিতুমীর বেশ সুনাম অর্জন করেন। হাফিজ নিয়ামতউল্লাহ ও হাফিজ মুহাম্মদ ইসরাইল কুস্তী প্রতিযোগিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

কুস্তীখেলার আর একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি হলেন মীর্জা গোলাম আম্বিয়া। তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় দান এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। তিনি ছিলেন শাহী

খান্দানের লোক এবং ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি ছিলেন জমিদার এবং নিঃসন্তান ছিলেন বলে জমিদারীর যা আয় হতো তার অধিকাংশই সৎকাজে ব্যয় করতেন।

কোলকাতা শহরের ভারত বিভাগপূর্ব কালের মীর্জাপুর আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে তাঁর জমিদার বাড়ী অবস্থিত ছিল। তাঁর বাড়ীর নাম ছিল মীর্জা মঞ্জিল। তাঁর নামানুসারে মীর্জাপুর স্ট্রীট নামকরণ করা হয়। মীর্জা মঞ্জিলের দক্ষিণে ছিল মীর্জা তালাব ও মীর্জাবাগ। এই মীর্জাবাগ পরে মীর্জাপুর পার্ক নামে অভিহিত হয়। যেখানে তাঁর বৈঠকখানা অবস্থিত ছিল, সেটাকে পরে বৈঠকখানা রোড নাম দেওয়া হয়। মীর্জা সাহেব সর্বদা এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে মীর্জাপুর ও বৈঠকখানা রোডের জমি, মীর্জা তালাব, মীর্জাবাগ প্রভৃতি কোলকাতা মিউনিসিপালটিকে দান করে এবং বাড়ীঘর ও অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি বিক্রী করে মক্কায় হিজরত করেন। যে মীর্জা তালাব ও মীর্জাবাগ ব্রিটিশ রাজত্বের প্রায় শেষ অবধি মীর্জাপুর পার্ক নামে অভিহিত ও সুপরিচিত ছিল, বিংশতি শতাব্দীর তিনের দশকে তার নাম দেয়া হয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। এ অধিকার ন্যায়তঃ মিউনিসিপালিটি ছিল না। মীর্জাপুর পার্কে বিশ-পঁচিশ হাজার বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমবেত হয়ে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

উক্ত মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার সান্নিধ্যে আসার পর মীর নিসার আলীর একজন কামেল মুর্শিদের হাতে বয়আত করার প্রবল আগ্রহ জাগে। অতঃপর জাকী শাহ নামক জনৈক দরবেশ কোলকাতার তালিবটোলায় আগমন করলে নিসার আলী তাঁর দরবারে হাজির হয়ে মুরীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। শাহ সাহেব তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, "বায়তুল্লাহ শরীফের জিয়ারত না করলে তুমি নিযুক্ত পীরের সন্ধান পাবে না।"

প্রকৃত মুর্শিদ প্রাপ্তির আশায় অবশেষে মীর নিসার আলী মক্কা গমন করেন এবং সেখানেই সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এখানেই মীর নিসার আলী তাঁর হাতে বয়আত করে মুরীদ হন।

হজ্জ্ব ও অন্যান্য ক্রিয়াদি সমাপনান্তে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী তাঁর খলিফা মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল ও মওলানা ইসহাককে নিম্নরূপ নির্দেশ দেনঃ—

"তোমরা আপন আপন বাড়ী পৌছে দিন পনেরো বিশ্রাম নিবে। তারপর তোমরা বেরেলী পৌছুলে তোমাদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান সফর করব। পাটনায় কয়েকদিন বিশ্রামের পর কোলকাতা যাব।

বাংলাদেশের খলিফাগণের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল নিম্নরূপ ঃ-

আমি পাটনায় পৌছে মওলানা আবদুল বারী খাঁ (মওলানা আকরাম খাঁর পিতা), মওলানা মুহাম্মদ হোসেন, মওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ, মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর), মওলানা সুফী খোদাদাদ সিদ্দিকী ও মওলানা কারামত আলীকে খবর দিব। আমার কোলকাতা পৌছার দিন তারিখ তোমরা তাদের কাছে জানতে পারবে। কোলকাতায় আমাদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে তাতে আমাদের চূড়ান্ত কর্মসূচী গৃহীত হবে।

অতঃপর সকলে মক্কা থেকে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা কোলকাতার শামসুন্নিসা খানমের বাগানবাড়ীতে সমবেত হন। আলোচনার পর স্থিরীকৃত হয় যে পাটনা মুজাহিদগণের কেন্দ্রীয় রাজধানী হবে এবং প্রত্যেক প্রদেশে হবে প্রাদেশিক রাজধানী। প্রাদেশিক রাজধানী থেকে কেন্দ্রে জিহাদ পরিচালনার অর্থ প্রেরণ করা হবে।

এসব সিদ্ধান্তের পর মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর) উক্ত বৈঠকে যে ভাষণ দান করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—

বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদেরকে খাঁটি মুসলমান না করা পর্যন্ত তাদেরকে জেহাদে পাঠানো বিপজ্জনক হবে। আমি তাদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত পৌছাবার দায়িত্ব নিচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমি মনে করি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আমাদের সংগ্রামে যোগদান করতে পারে।. . . কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতির উপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্তুষ্ট নয়। আমরা যদি মুসলমানদেরকে পাকা মুসলমান বানিয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহলে . . . কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কেন্দ্রকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না।

পরামর্শ সভায় অতঃপর স্থির হলো, বাংলা কেন্দ্রকে অপর সকল বিষয়ে গোপনে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করবে না। তবে যাঁরা কেন্দ্রের সাথে যোগদান করার ইচ্ছা করবে, তাদেরকে বাধা দেয়া হবে না। (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ২২-৩৭)।

তারপর সাইয়েদ নিসার আলী তাঁর কর্মতৎপরতা শুরু করেন যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা নিম্নে করতে চাই। তাঁর শিক্ষাজীবন থেকে আরম্ভ করে কোলকাতার জীবন, পীরের সন্ধানে ভ্রমণ, হজ্জপালন, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর শিষ্যত্ব লাভ প্রভৃতি কার্যক্রমের বিবরণ উপরে দেয়া হলো। তিনি যে কখনো কোন হিন্দু জমিদারের গুন্ডাবাহিনীতে ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল হিসাবে কাজ করেছেন, এ কথা একেবারে অমূলক ও ভিত্তিহীন। তাঁর মহান আদর্শ, চরিত্র ও মহত্বকে বিকৃত করে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় ও ঘৃণিত করবার এ এক পরিকল্পিত অপপ্রয়াস।

তিতুমীর তাঁর উপরোক্ত ভাষণে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান বড়োই দুর্বল হয়ে পড়েছে।" তাঁর আন্দোলন তৎপরতা আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার মুসলমানদের ঈমান কতখানি দুর্বল ছিল এবং কি পরিবেশে তিনি তাঁর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন। বাংলার হিন্দুজাতি ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং আপন মাতৃভূমির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদেরকে শুধু রাজ্যচ্যুতই করেনি, জীবিকা অর্জনের সকল পথ রুদ্ধ করেছে এবং একজন মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল ঈমানটুকুও নষ্ট করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। মুসলমানদেরকে নামে মাত্র মুসলমান রেখে ঈমান, ইসলামী জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি থেকে দূরে নিক্ষেপ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষাও এক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে তাদেরকে দাসানুদাসে পরিণত করতে চেয়েছিল।

মুসলমান জাতি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কতখানি অধঃপতনে নেমে গিয়েছিল তার আলোচনা আমরা পূর্ববর্তী 'মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, শীর্ষক অধ্যায়ে করেছি। তিতুমীরের সময়ে সে অবস্থার কতখানি অবনতি ঘটেছিল, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

বাংলার নতুন হিন্দু জমিদারগণ হয়ে পড়েছিল ইংরেজদের বড়োই প্রিয়পাত্র। একদিকে তাদেরকে সকল দিক দিয়ে তুষ্ট রাখা এবং মুসলমানদিগকে দাবিয়ে রাখার উপরেই এ দেশে তাদের কায়েমী শাসন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের উপর হিন্দু জমিদারগণ ন্যায় অন্যায় আদেশ জারী করার সাহস পেতো।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদেরকে যেমন ব্রাহ্মণেরা ধর্মকর্মের স্বাধীনতা ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল, অনুরূপভাবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমানদের মধ্যেও একদল লোককে মুসলমান ব্রাহ্মণরূপে দাঁড় করিয়ে মুসলমান জনসাধারণকে ইসলামের আলোক থেকে বঞ্চিত করলো।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে বলেন ঃ—

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জমিদার ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিরক্ষর মুসলমানদেরকে বুঝাইল ঃ তোরা গরীব। কৃষিকার্য ও দিনমজুরী না করলে তোদের সংসার চলে না। এমতাবস্থায় তোদের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক নামাজ এবং রোজা, হজ্জ, জাকাত, জানাজা, প্রার্থনা, মৃতদেহ স্নান করানো প্রভৃতি ধর্মকর্ম করিবার সময় কোথায়? আর ঐ সকল কার্য করিয়া তোরা অর্থোপার্জন করিবার সময় পাইবি কখন এবং সংসার- যাত্রাই বা করিবি কি প্রকারে? সুতরাং তোরাও হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় একদল লোক ঠিক কর তারা তোদের হইয়া ঐ সকল ধর্মকার্যগুলি করিয়া দিবে, তোদেরও সময় নষ্ট হইবেনা।

দ্বীন ইসলামের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও কৃষিমজুর শ্রেণীর মুসলমানেরা বাবুদিগের এই পরামর্শ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিল। ক্রমে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজেও এই ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িল। এই সঙ্গে আজাজিল শয়তান এবং নফ্‌স আম্মারা তাহাদিগকে প্ররোচনা দান করিল। তাহারা বাবুদিগের কথার জবাবে বলিল ঃ

> বাবু আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। এতদিন আমাদিগকে এই প্রকার হিতোপদেশ আর কেহ দেন নাই। আমরা নির্বোধ, কিছু বুঝি না। আপনি আমাদের জন্য যাহা বিবেচনা করেন তাহা করুন।
>
> (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৫–৬)।

বলাবাহুল্য, মুসলমানদের ব্রাহ্মণ সাজবার লোকেরও অভাব হলো না। প্রাচীনকালে মুসলমানদের শাহী দরবারে এক শ্রেণীর মুসলমানকে তাদের যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ ভালো ভালো উপাধিতে ভূষিত করা হতো, উপরন্তু তাদের ভরণপোষণের জন্যে আয়মা, লাখেরাজ ও বিভিন্ন প্রকারের ভূসম্পত্তি দান করা হতো। ইংরেজদের আগমনের পর তাদের এসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারা হয়ে পড়ে নিঃস্ব—বিত্তহীন। শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিল না বলে তাদের জীবিকার পথও বন্ধ হয়ে গেল। বিদ্যা শিক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না।

বলতে গেলে তারা সম্ভ্রান্ত ভিখারীর দলে পরিণত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল কিছুসংখ্যক শেখ, সৈয়দ, মীর, কাজী প্রভৃতি নামধারী লোক। তারা ছিল প্রাচীন বুনিয়াদী ঘরের সন্তান। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তাদেরকে এখন কৃষক, শ্রমিক মজুরদের দ্বারস্থ হতে হয়। তাদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাদেরকে সহানুভূতির সুরে বলতে লাগলো ঃ

> চাষী মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এখন আর আপনাদেরকে পূর্বের ন্যায় মানে না, মানতে চায় না। ভক্তিশ্রদ্ধাও করেনা। তাদের এরূপ ব্যবহারে আমরাও হৃদয়ে খুব বেদনা অনুভব করে থাকি। কি আর করা যাবে—কলিকাল। আমরা চাই যে তাদের ধর্ম কাজগুলি করে দেবার দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত করে আপনাদেরকে সাহায্য করব। আপনারা মুসলমান সমাজের আখঞ্জী, মোল্লা, উস্তাদজী, মুনশী, কাজী প্রভৃতি পদ গ্রহণ করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করুন। তাহলে আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তারাও আপনাদের অনুগত থাকবে। ধনহারা, মূর্খ, অর্ধমূর্খ, শরাফতীর দাবীদার শেখ, সৈয়দ, মীর ও কাজীর দল হিন্দু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বাবুদিগের কথায় ভুল্লো। তারা আখঞ্জী, মোল্লা, উস্তাদজী ও মুন্সীর পদ গ্রহণ করে মুসলমান জাতির ব্রাহ্মণ সেজে বসলো। মুসলিম জনগোষ্ঠীর জাতীয় সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করল। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণের আদর্শে মুসলমান সমাজেও ব্রাহ্মণের পদ সৃষ্ট হলো। সাধারণ মুসলমানরা আপাতঃ মধুর ভাবে বিভোর হয়ে ইসলাম ও ইসলামী শরিয়তের পথ থেকে বহুদূরে বিচ্যুত হয়ে পড়লো। হিন্দু ব্রাহ্মণজাতির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে তারা আত্মহত্যা করলো। (শহীদ তিতুমীর—আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৭ দ্রঃ)।

মুসলমানদের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিরান হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে হিন্দু পন্ডিতদের গ্রাম্য পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে। সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদেরকে এসব পাঠশালার গুরুমশায়, কুমার, কামার, ধোপা, নাপিত, গণকঠাকুর প্রভৃতির সাথেই মিলামিশা করতে হতো। এরা সকলে মিলে মুসলমান ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল।

মুসলমানদের মধ্যে যাদের সামর্থ ছিল তারা তাদের সন্তানদেরকে এসব পাঠশালায় প্রেরণ করতো। এখানে হিন্দু ছাত্রদের সাথে মুসলমান ছাত্রদেরকেও নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতি, বিশেষ করে সরস্বতীর বন্দনা মুখস্থ করতে হতো।

পাঠ্যপুস্তকগুলি হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তন, দেবদেবীর বন্দনা ও স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমান ছাত্রের কচি-কোমল হৃদয়ে হিন্দুধর্মের ছাপ অংকিত হয়ে যেতো। স্কুলে পড়াশেষে নিম্নের ছড়া আবৃত্তি করে গুরু মশায়কে নমস্কার করে বাড়ী যেতে হতো—

সরস্বতী ভগবতী, মোরে দাও বর,
চল ভাই পড়ে সব, মোরা যাই ঘর।
ঝিকি মিকি ঝিকিরে সুবর্ণের চক,
পাত-দোত নিয়ে চল, জয় গুরুদেব।

তার পর রইলো নৈতিক দিক। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মমত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে হিন্দুজাতির চরম নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা, ধর্মের নামে নেড়া-নেড়ী তথা মুন্ডিত কেশ বৈষ্ণব-বৈষবীদের যে জঘন্য যৌন অনাচারের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল তা শুধু হিন্দু সমাজের একটা বৃহত্তর অংশকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ অনাচারের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। বামাচারী তান্ত্রিকদের যৌন অনাচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যেও একশ্রেণীর ভন্ড যৌনাচারীর আবির্ভাব ঘটে এবং তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ধর্মের নামে যৌন উচ্ছৃংখলতার (SEXUAL ANARCHY) পংকিল গর্তে নিমজ্জিত করে।. তদুপরি পীরপূজা ও কবরপূজার ব্যাপক প্রচলন মুসলমানদেরকে পৌত্তলিক হিন্দুসম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছিল।

তারপর মুসলমানদের নামকরণের ব্যাপারেও হিন্দুরা অন্যায় হস্তক্ষেপ করা থেকেও ক্ষান্ত হয়নি। বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার নামে তারা মুসলমানদেরকে বিপথে টেনে নিয়ে গেছে। হিন্দু ঠাকুর মশায়রা বলা শুরু করলো ঃ

তোমরা বাপু মুসলমান হলেও বাংলাদেশের মুসলমান। আরবদেশের মুসলমানের জন্যে যেমন আরবী নামের প্রয়োজন, বাংলাদেশের মুসলমানের জন্যে তেমনি বাংলা নামের প্রয়োজন। আবদুর রহমান, আবুল কাসেম, রহীমা খাতুন, আয়েশা, ফাতেমা নামের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় নামের প্রয়োজন।

অতএব ঠাকুর মশায়ের ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমানদের নাম রাখা হতে লাগলো গোপাল, নেপাল, গোবর্ধন, নবাই, কুশাই, পদ্মা, চিনি, চাঁপা, বাদল, পটল, মুক্তা প্রভৃতি। ছোটবেলা গ্রামাঞ্চলের বহু মুসলমানের এ ধরনের নামের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম।

অতঃপর ঠাকুর মশায়দের হিতোপদেশে বিভ্রান্ত হয়ে মুসলমানরা তহবন্দ ছেড়ে ধূতি পরিধান করা শুরু করলো, দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখা ধরলো। বলতে গেলে মুসলমানকে মুসলমান বলে চিনবার কোন উপায়ই ছিল না।

মুসলমানদের এ চরম ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের সময় সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি তাঁর মহান কাজ পরিপূর্ণ করে যেতে পারেননি বটে, কিন্তু যে ধর্মীয় ও নৈতিক অনাচার এবং হিন্দু জমিদারদের অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তা পরবর্তীকালে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আজাদীর পথে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে।

তিতুমীর কোলকাতায় সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর পরামর্শ সভা সমাপ্তের পর নিজ গ্রাম চাঁদপুরে ফিরে এসে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।

তিতুমীরের দাওয়াতের মূলকথা ছিল ইসলামে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং প্রত্যেকটি কাজেকর্মে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন। হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়নকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই বলেন যে, কৃষক সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সরফরাজপুর নামক গ্রামবাসীর অনুরোধে তিনি তথাকার শাহী আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচারের জন্যে তাঁর একটি খানকাহ স্থাপন করেন। এখানে জুমার নামাজের পর তিনি সমবেত হিন্দু-মুসলমানকে আহবান করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। যারা মুসলমান নয় তাদের সাথে, শুধু ধর্মের দিক দিয়ে পৃথক বলে, বিবাদ বিসম্বাদ করা আল্লাহ ও তাঁর রসূল কিছুতেই পছন্দ করেন না। তবে ইসলাম এ কথা বলে যে, যদি কোন প্রবল শক্তিশালী অমুসলমান কোন দুর্বল মুসলমানের উপর অন্যায় উৎপীড়ন করে, তাহলে মুসলমানরা সেই দুর্বলকে সাহায্য করতে বাধ্য।

তিনি আরও বলেন, মুসলমানদেরকে কথাবার্তায়, আচার-আচরণে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। তারা যদি অমুসলমানের আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কাজকর্ম পছন্দ করে তাহলে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদেরকে

অমুসলমানদের সাথে স্থান দিবেন। তিতুমীর বলেন, ইসলামী শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মা'রফাৎ—এ চার মিলিয়ে মুসলমানদের পূর্ণাংগ জীবন এবং এর মধ্যেই রয়েছে তাদের ইহকাল পরকালের মুক্তি। এর প্রতি কেউ উপেক্ষা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছাঁটা মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যারা অমুসলমানদের আদর্শে এসব পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

এ ছিল তাঁর প্রাথমিক দাওয়াতের মূলকথা। তিনি অনর্গল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন এবং তাঁর বক্তৃতা ও প্রচারকার্য বিপথগামী ও সুপ্ত মুসলমানদের মধ্যে এক অভাবিতপূর্ব জাগরণ এনে দিল।

তিতুমীর যে কাজ শুরু করলেন তার মধ্যে অন্যায়ের কিছু ছিল না। বরঞ্চ মুসলমান হিসাবে এ ছিল তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু বর্ণহিন্দুগণ তা সহ্য করবে কেন? মুসলমান জাতিকে নির্মূল করার গভীর ষড়যন্ত্র তাদের নস্যাৎ হয়ে গেল, তারা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লো তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি। তাদেরকে নির্মূল করার জন্যে আর এক নতুন চক্রান্ত শুরু হলো।

সরফরাজপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পুনঃসংস্কার, আবার জামায়াতে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা, নামাজান্তে সমবেত লোকদের সামনে তিতুমীরের জ্বালাময়ী ভাষণ— পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল করে তুল্লো। তিতুমীরের গতিবিধি ও প্রচার-প্রচারণার সংবাদাদি সংগ্রহের ভার জমিদারের অনুগত ও বিশ্বস্ত মুসলমান পাইক মতির উপর অর্পিত হলো। জমিদার মতিকে বল্লো—

তিতু ওহাবী ধর্মাবলম্বী। ওহাবীরা তোমাদের হযরত মুহাম্মদের ধর্মমতের পরম শত্রু। কিন্তু তারা এমন চালাক যে, কথার মধ্যে তাদেরকে ওহাবী বলে ধরা যাবে না। সুতরাং আমার মুসলমান প্রজাদেরকে বিপথগামী হতে দিতে পারি না। আজ থেকে তিতুর গতিবিধির দিকে নজর রাখবে এবং সব কথা আমাকে জানাবে।

অতঃপর কৃষ্ণদেব রায় গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এবং গোবরডাঙার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিতুমীরের বিরুদ্ধে শান্তিভংগের নালিশ করার জন্যে কিছু প্রজাকে বাধ্য করল। তারপর জমিদারের আদেশে মতিউল্লাহ্ তার চাচা গোপাল, জ্ঞাতিভাই নেপাল ও

গোবর্ধনকে নিয়ে জমিদারের কাচারীতে উপস্থিত হয়ে নালিশ পেশ করলো। তার সারমর্ম নিম্নরূপ—

চাঁদপুর নিবাসী তিতুমীর তার ওহাবী ধর্ম প্রচারের জন্যে আমাদের সর্পরাজপুর (মুসলমানী নাম সরফরাজপুর) গ্রামে এসে আখড়া গেড়েছে এবং আমাদেরকে ওহাবী ধর্মমতে দীক্ষিত করার জন্যে নানারূপ জুলুম জবরদস্তি করছে। আমরা বংশানুক্রমে যেভাবে বাপদাদার ধর্ম পালন করে আসছি, তিতুমীর তাতে বাধা দান করছে। তিতুমীর ও তার দলের লোকেরা যাতে সর্পরাজপুরের জনগণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে না পারে, জোর করে আমাদের দাড়ি রাখতে, গোঁফ ছাঁটতে, গোহত্যা করতে, আরব দেশের নাম রাখতে বাধ্য করতে না পারে, হিন্দু-মুসলমানে দাংগা বাধাতে না পারে, হুজুরের দরবারে তার বিহিত ব্যবস্থার জন্যে আমাদের নালিশ। হুজুর আমাদের মনিব। হুজুর আমাদেরবাপ-মা।

গোপাল, নেপাল, গোবর্ধনের টিপসইযুক্ত উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর জমিদার কৃষ্ণদেব রায় হুকুম জারী করলো—

১। যারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওহাবী হবে, দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছাঁটবে তাদেরকে ফি দাড়ির জন্যে আড়াই টাকা ও ফি গোঁফের জন্যে পাঁচ সিকা করে খাজনা দিতে হবে।

২। মসজিদ তৈরী করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্যে পাঁচশ' টাকা এবং প্রতি পাকা মসজিদের জন্যে এক হাজার টাকা করে জমিদার সরকারে নজর দিতে হবে।

৩। বাপদাদা সন্তানদের যে নাম রাখবে তা পরিবর্তন করে ওহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্যে খারিজানা ফিস পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হবে।

৪। গোহত্যা করলে তার ডান হাত কেটে দেয়া হবে— যাতে আর কোনদিন গোহত্যা করতে না পারে।

৫। যে ওহাবী তিতুমীরকে বাড়ীতে স্থান দিবে তাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

(শহীদ তিতুমীর—আবদুল গফুর সিদ্দিকী পৃঃ ৪৮, ৪৯; স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর পৃঃ ১১৯; Bengal Criminal

Judicial Consultations, 3 April 1832, No. 5 and No. 6)।

মুসলমান প্রজাদের উপরে উপরোক্ত ধরনের জরিমানা ও উৎপীড়নের ব্যাপারে তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ, কুরগাছির জমিদারের নায়েব নাগরপুর নিবাসী গৌড় প্রসাদ চৌধুরী এবং পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নাম পাওয়া যায়— Bengal Criminal Judicial Consultancy, 3 April 1832. No. 5 রেকর্ডে। (Dr. A. R. Mallick, British Policy & the Muslims in Bengal, p. 76)।

বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জমিদার রাম নারায়ণের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল যাতে জনৈক সাক্ষী একথা বলে যে— উক্ত জমিদার দাড়ি রাখার জন্যে তার পঁচিশ টাকা জরিমানা করে এবং দাড়ি উপড়ে ফেলার আদেশ দেয়। Bengal Criminal Judicial Consultations, No. 5; Dr. A. R. Mallick, Br. Policy & the Muslims in Bengal, p. 76)।

তিতুমীর কৃষ্ণদেব রায়কে একখানা পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, তিনি কোন অন্যায় কাজ করেননি, মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করছেন। এ কাজে হস্তক্ষেপ করা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছাঁটা প্রভৃতি মুসলমানের জন্যে ধর্মীয় নির্দেশ। এ কাজে বাধা দান করা অপর ধর্মে হস্তক্ষেপেরই শামিল।

তিতুমীরের জনৈক পত্রবাহক কৃষ্ণদেব রায়ের হাতে পত্রখানা দেয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তাও পাঠক সমাজের জেনে রাখা প্রয়োজন আছে—তা এখানে উল্লেখ করছি।

পত্রখানা কে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করলে পত্রবাহক চাঁদপুরের তিতুমীর সাহেবের নাম করে। তিতুমীরের নাম শুনতেই জমিদার মশায়ের গায়ে আগুন লাগে। রাগে গর গর করতে করতে সে বল্লো, কে সেই ওহাবী তিতু? আর তুই ব্যাটা কে?

নিকটে জনৈক মুচিরাম ভান্ডারী উপস্থিত ছিল। সে বল্লো, ওর নাম আমন মন্ডল। বাপের নাম কামন মন্ডল। ও হুজুরের প্রজা। আগে দাড়ি কামাতো, আর এখন দাড়ি রেখেছে বলে হুজুর চিনতে পারছেন না।

পত্রবাহক বল্লো, হুজুর আমার নাম আমিনুল্লাহ, বাপের নাম কামালউদ্দীন, লোকে আমাদেরকে আমন-কামন বলে ডাকে। আর দাড়ি রাখা আমাদের ধর্মের আদেশ। তাই পালন করেছি।

কৃষ্ণদেব রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বল্লো, ব্যাটা দাড়ির খাজনা দিয়েছিস, নাম বদলের খাজনা দিয়েছিস? আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। ব্যাটা আমার সাথে তর্ক করিস, এত বড়ো তোর স্পর্ধা? এই বলে মুচিরামের উপর আদেশ হলো তাকে গারদে বন্ধ করে উচিত শাস্তির। বলা বাহুল্য, অমানুষিক অত্যাচার ও প্রহারের ফলে তিতুমীরের ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ হলো আমিনুল্লাহ। সংবাদটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুসলমানরা মর্মাহত হলো, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণের অভাবে প্রবল শক্তিশালী জমিদারের বিরুদ্ধে কিছুই করতে না পেরে তারা নীরব রইলো।

কোলকাতায় জমিদারদের ষড়যন্ত্র সভা

তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের দমন করার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় জনৈক লাটু বাবুর বাড়ীতে এ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত হাজির হলেন ঃ লাটু বাবু (কোলকাতা), গোবরডাঙার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়, নূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, বশীরহাট থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তী, যদুর আটির দুর্গাচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

সভায় স্থিরীকৃত হলো যে, যেহেতু তিতুমীরকে দমন করতে না পারলে হিন্দুজাতির পতন অনিবার্য, সেজন্যে যে কোন প্রকারেই হোক তাকে শায়েস্তা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সকল জমিদারগণ সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। ইংরেজ নীলকরদেরও সাহায্য গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হলো। তাদেরকে বুঝানো হবে যে, তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম শুরু করেছেন। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এ কথা প্রচার করতে হবে যে তিতু গো-মাংস দ্বারা হিন্দুর দেবালয়াদি অপবিত্র করেছেন এবং হিন্দুর মুখে কাঁচা গো-মাংস গুঁজে দিয়ে জাতি নাশ করেছেন। বশীরহাটের দারোগা চক্রবর্তীকে এ ব্যাপারে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার অনুরোধ জানানো হলো। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় দারোগাকে বল্লেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ। তাছাড়া আপনি আমাদের অনেকেরই আত্মীয়। আমাদের এ বিপদে আপনাকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে হবে। দারোগা বল্লো, আমি আমার প্রাণ দিয়েও সাহায্য করব এবং তিতুমীরকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করব।

কোলকাতার ষড়যন্ত্র সভার পর সরফরাজপুরের লোকদের নিকট থেকে দাড়ি-গোঁফের খাজনা এবং আরবী নামকরণের খারিজানা ফিস্ আদায়ের জন্যে কৃষ্ণদেব রায় লোক পাঠালো। কিন্তু তারা খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জমিদারের কর্মচারী ফিরে এসে জমিদারকে এ বিষয়ে অবহিত করে। অতঃপর তিতুমীরকে ধরে আনার জন্যে বারোজন সশস্ত্র বরকন্দাজ পাঠানো হয়। কিন্তু তারা ধরে আনতে সাহস করেনি।

অতঃপর কৃষ্ণদেব নিম্নের ব্যক্তিগণকে পরামর্শের জন্যে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে ঃ

১। অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গোবরডাঙায়,
২। খড়েশ্বর মুখোপাধ্যায়কে গোবরা-গোবিন্দপুরে,
৩। লাল বিহারী চট্টোপাধ্যায়কে সেরপুর নীলকুঠির মিঃ বেন্জামিনের কাছে,
৪। বনমালী মুখোপাধ্যায়কে হুগলী নীলকুঠিতে,
৫। লোকনাথ চক্রবর্তীকে বশীরহাট থানায়।

উল্লেখযোগ্য যে, লোকনাথ চক্রবর্তী বশীরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর ভগ্নিপতি।

অতঃপর বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষ্ণদেবের সাহায্যার্থে সহস্রাধিক লাঠিয়াল, সড়কীওয়ালা ও ঢাল-তলোয়ারধারী বীর যোদ্ধা কৃষ্ণদেবের বাড়ি পুঁড়ায় পৌছে গেল। পরদিন শুক্রবার সরফরাজপুরে তিতুমীর ও তাঁর লোকজনদেরকে আক্রমণ করার আদেশ হলো।

পরদিন শুক্রবার সর্বাগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণদেব রায় এবং তার পিছনে সশস্ত্র বাহিনী যখন সরফরাজপুর পৌছে, তখন জুমার খুৎবা শেষে মুসল্লীগণ নামাজে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণদেবের সৈন্যেরা বিভিন্ন মুসলিম বিরোধী ধ্বনি সহকারে মসজিদ ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দিল। অল্প বিস্তর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তিতুমীর এবং মুসল্লীগণ মসজিদের বাইরে এলে তাদেরকে আক্রমণ করা হলো। দু'জন সড়কীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো এবং বহু আহত হলো।

অতঃপর মুসলমানগণ কলিঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে কৃষ্ণদেব রায় ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে খুনজখম মারপিট প্রভৃতির মামলা দায়ের করলো। পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ইজাহার গ্রহণ করলো বটে। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হয়েই লাশ দাফন করার নির্দেশ দিল।

J. R. Colvin-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জমিদারের কর্মচারীগণ সরফরাজপুরে দাড়ি-গোঁফ ইত্যাদির খাজনা আদায় করতে গেলে তাদেরকে মারপিট করা হয় এবং একজনকে আটক করা হয়। তারপর কৃষ্ণদেব রায় সশস্ত্র বাহিনীসহ তাদেরকে আক্রমণ করে এবং মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়।

(Board's Collection 54222, p. 405-6, Colvin's Report—para 9; Dr. A. R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal, p. 79)।

উক্ত ঘটনার আঠার দিন পর কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে এই বলে মামলা দায়ের করে যে, তারা তার লোকজনকে মারপিট করেছে এবং তাকে ফাঁসাবার জন্যে তারা নিজেরাই মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছে। (Bengal Criminal Judicial Consultations, 3 April 1832, No. 6)।

কৃষ্ণদেব রায় তার ইজাহারে আরও অভিযোগ করে যে, 'নীলচাষদ্রোহী, জমিদারদ্রোহী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীদ্রোহী তিতুমীর নামক ভীষণ প্রকৃতির এক ওহাবী মুসলমান এবং তার সহস্রাধিক শিষ্য পুঁড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব রায় মহাশয়ের দু'জন বরকন্দাজ ও একজন গোমস্তাকে অন্যায় ও বেআইনীভাবে কয়েদ করিয়া গুম্ করিয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহাদের পাইতেছিনা। আমাদের উক্ত পাইক ও গোমস্তা সরফরাজপুর মহলের প্রজাদের নিকট খাজনা আদায়ের জন্য মহলে গিয়াছিল। খাজনার টাকা লেনদেন ও ওয়াশীল সম্বন্ধে প্রজাদের সহিত বচসা হওয়ায় তিতুমীরের হুকুম মতে তাহার দলের লোকেরা আমাদের গোমস্তা পাইকদিগকে জবরদস্তি করিয়া কোথায় কয়েদ করিয়াছে তাহা জানা যাইতেছে না। তিতুমীর দম্ভভরে প্রচার করিতেছে যে, সে এদেশের রাজা। সুতরাং খাজনা আর জমিদারকে দিতে হইবেনা।' (শহীদ তিতুমীর- আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৬০)।

কিভাবে মিথ্যা মামলা সাজাতে হয় তা রামরাম চক্রবর্তীর অন্ততঃপক্ষে ভালো করে জানা ছিল। কারণ সে তিতুমীরকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যাহোক, ঘটনার আঠার দিন পর জমিদারের ইজাহার যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা না বল্লেও চলে। এ শুধু গা বাঁচাবার জন্যে করা হয়েছিল। তবু উভয় মামলার তদন্ত শুরু হয়।

মামলার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে কলিঙ্গা ফাঁড়ির জমাদার। তার রিপোর্টে বলা হয় যে, উভয় পক্ষের অভিযোগ অত্যন্ত সংগীন। সে আরও বলে, আমি মুসলমানদের অভিযোগের বহু আলামত দেখেছি। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নায়েব তিতুমীর ও তার দলের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করেছে সে সম্পর্কে তদন্ত করে জানা গেল যে, যেসব কর্মচারীর অপহরণের অভিযোগ করা হয়েছে তারা সকলেই নায়েবের সঙ্গেই আছে। নায়েবের জবাব এই যে, সে মফঃস্বলে যাওয়ার পর তিতুর লোকেরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। আমার মতে এ জটিল মামলা দুটির তদন্ত ও ফাইনাল রিপোর্টের ভার বশীরহাটের অভিজ্ঞ দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর উপর অর্পণ করা হোক।

ওদিকে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণদেব রায়কে কোর্টে তলব করে জামিন দেন এবং রামরাম চক্রবর্তীকে তদন্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়ার আদেশ দেন।

রামরাম চক্রবর্তী তদন্তের নাম করে সরফরাজপুর আগমন করে তিতুমীর ও গ্রামবাসীকে অকথ্যভাষায় গালাগালি ও মারপিট করে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীতে কয়েকদিন জামাই আদরে কাটিয়ে যে রিপোর্ট দেয় তা নিম্নরূপ ঃ-

১। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের গোমস্তা ও পাইকদেরকে তিতু ও তার লোকেরা বেআইনীভাবে কয়েদ করে রেখেছিল। পরে তারা কৌশলে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছিল। পুলিশের আগমনের পর তারা আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং এ মামলা অচল ও বরখাস্তের যোগ্য।

২। তিতুমীর ও তার লাঠিয়ালেরা জমিদার কৃষদেব রায় ও তার পাইক বরকন্দাজদের বিরুদ্ধে খুনজখম, লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির মিথ্যা অভিযোগএনেছে।

৩। তিতু ও তার লোকেরা নিজেরাই নামাজঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। অতএব এ মামলা চলতে পারে না।

দারোগার রিপোর্ট সম্পূর্ণ মনগড়া এবং তার বিদ্বেষাত্মক মনের অভিব্যক্তি মাত্র। মুসলমানদের শত দোষ থাক কিন্তু মসজিদ ভস্মিভূত করার মতো পাপ কাজ করতে সাহস তাদের কখনোই হবে না।

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, অবৈধ খাজনা আদায়ের বিষয়টি হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি যা ছিল দাংগার মূল কারণ। তার ফলে জমিদার শুধু মামলায় জয়লাভই করেনি, বরঞ্চ তার অবৈধ খাজনা আদায়ের কাজকে বৈধ

করে দেয়া হলো। বিভাগীয় কমিশনার বলেন, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে রায় দিলেন তার মধ্যে একদিকে জমিদারদের অবৈধ ও উৎপীড়নমূলক খাজনা বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিলনা, অপরদিকে প্রতিপক্ষের উত্তেজনাকর মনোভাব লাঘব করারও কিছু ছিল না। (Bengal Criminal Judicial Consultations, 3 April 1832, No. 3; Commissioner to Deputy Secretary; 28 Nov. 1831, para 3)।

ম্যাজিস্ট্রেটের এ অবিচারমূলক রায়ের ফলে জমিদার প্রতারণামূলক ও উৎপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহসী হলো। ১৭৯৯ সালের ৭ নং রেগুলেশন অনুযায়ী বকেয়া খাজনার নাম করে প্রজাদেরকে ধরে এনে আটক করার ক্ষমতা লাভ করলো। এমনকি যারা জমিদারের প্রজা নয় অথচ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তাদেরকে মিছিমিছি ৩৮ টাকা বকেয়া দেখিয়ে ধরে এনে আটক করা হলো এবং তাদেরকে নানাভাবে শারীরিক শাস্তি দেয়া হলো। অতঃপর বকেয়ার একাংশ আদায় করে বাকী অংশ দিবার প্রতিশ্রুতিতে তাদের কাছে মুচলেকা লিখে নেয়া হলো যাতে করে কোর্টের আশ্রয় নিতে না পারে। (Board's Collection, 54222, Enclosure No 4. the Colvin's Report; Also in Bengal Criminal Judicial Consultations, 3 April 1832 No. 6)।

১৮৩১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মামলার রায়ের নকলসহ মুসলমানরা কমিশনারের কোর্টে আপিল করার জন্যে কোলকাতা গেল। কিন্তু কমিশনারের অনুপস্থিতির দরুন তাদের আপিল দাখিল করা সম্ভব হলো না বলে ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

সরফরাজপুর গ্রামের মসজিদ ধ্বংস হলো, বহু লোক হতাহত হলো, হাবিবুল্লাহ, হাফিজুল্লাহ, গোলাম নবী, রমজান আলী ও রহমান বখ্‌শের বাড়ীঘর ভস্মস্তূপে পরিণত করা হলো, বহু ধনসম্পদ ভস্মিভূত ও লুণ্ঠিত হলো, কিন্তু ইংরেজ সরকার তার কোনই প্রতিকার করলো না। সরফরাজপুর গ্রামবাসীর এবং বিশেষ করে সাইয়েদ নিসার আলীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল বলে সকলের পরামর্শে সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর উপরোক্ত পাঁচজন গৃহহারাসহ সরফরাজপুর থেকে ১৭ই অক্টোবরে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানান্তরিত হলেন। ২৯শে অক্টোবর (১৮৩১) কৃষ্ণদেব রায় সহস্রাধিক লাঠিয়াল ও

বিভিন্ন অস্ত্রধারী গুন্ডাবাহিনীসহ নারিকেলবাড়িয়া গ্রাম আক্রমণ করে বহু নর-নারীকে মারমিট ও জখম করে। ৩০শে অক্টোবর পুলিশ ফাঁড়িতে ইজাহার হলো। কিন্তু কোনই ফল হলো না। কোন প্রকার তদন্তের জন্যেও পুলিশ এলো না।

উপর্যুপরি জমিদার বাহিনীর আক্রমণে মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে পড়লো। তখন বাধ্য হয়ে তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে হলো। ৬ই নভেম্বর পুনরায় কৃষ্ণদেব রায় তার বাহিনীসহ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় এবং উভয়পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। এরপর কৃষ্ণদেব রায় চারদিকে হিন্দু সমাজে প্রচার করে দেয় যে, মুসলমানরা অকারণে হিন্দুদের উপরে নির্যাতন চালাচ্ছে। তার এ ধরনের প্রচারণায় হিন্দুদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং গোবরডাঙ্গার নীলকর জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মোল্লাআটি নীলকুঠির ম্যানেজার মিঃ ডেভিসকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। ডেভিস প্রায় চার'শ হাবশী যোদ্ধা ও বিভিন্ন মারণাস্ত্রসহ নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। এবারও উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়। ডেভিস্ পলায়ন করে। মুসলমানরা তার বজরা ধ্বংস করে দেয়। উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এক বিরাট বাহিনীসহ নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। প্রচন্ড যুদ্ধে দেবনাথ রায় সড়কীর আঘাতে নিহত হয়।

উপরোক্ত ঘটনার পর চতুনার জমিদার মনোহর রায় পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট যে পত্র লিখেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেন ঃ

নীলচাষের মোহ আপনাদেরকে পেয়ে বসেছে। তার ফলেই আজ আমরা দেবনাথ রায়ের ন্যায় একজন বীর পুরুষকে হারালাম। এখনো সময় আছে। আর বাড়াবাড়ি না করে তিতুমীরকে তার কাজ করতে দিন আর আপনারা আপনাদের কাজ করুন। তিতুমীর তার ধর্ম প্রচার করছে, তাতে আপনারা জোট পাকিয়ে বাধা দিচ্ছেন কেন? নীলচাষের মোহে আপনারা ইংরেজ নীলকরদের সাথে এবং পাদ্রীদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে দেশবাসী ও কৃষক সম্প্রদায়ের যে সর্বনাশ করছেন তা তারা ভুলবে কি করে? আপনারা যদি এভাবে দেশবাসীর উপর গায়ে পড়ে অত্যাচার চালাতে থাকেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমি তিতুমীরের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হবো। আমি পুনরায় বলছি নীলচাষের জন্যে আপনারা দেশবাসীর অভিশম্পাত কুড়াবেন না।

—শ্রীমনোহর রায় ভূষণ (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী পৃঃ ৭৯)।

মনোহর রায়ের সদুপদেশ গ্রহণ করলে ইতিহাসের এতবড়ো একটা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হতো না। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায়ের একদিকে সীমাহীন ধনলিপ্সা এবং অপরদিকে চরম বিদ্বেষ তাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলেছিল। তাই সে তার পৈশাচিক তৎপরতা থেকে ক্ষান্ত হতে পারেনি।

বশীরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তী তিতুমীর ও তার দলের লোকদের বিরুদ্ধে যেসব কাল্পনিক, বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্ট সরকারের নিকটে পেশ করেছিল এবং হিন্দু জমিদারগণও যেসব পত্র কালেক্টর ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিতুমীরের বিরুদ্ধে লিখেছিল, তার উপরে ভিত্তি করেই ম্যাজিস্ট্রেট তিতুমীরকে দমন করার জন্যে গভর্ণরকে অনুরোধ জানায়। গভর্ণর আবার উপরোক্ত রিপোর্টসহ নদিয়ার কালেক্টর ও আলীপুরের জজকে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। এদিকে গভর্ণরের আদেশ পাওয়া মাত্র নদিয়ার কালেক্টর কৃষ্ণদেব রায়কে যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁর সাথে দেখা করতে বলেন। আলীপুরের জজ সে সময় নদিয়াতেই অবস্থান করছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় যথাসময়ে উপস্থিত হলে কালেক্টর ও জজ সাহেবের বজরার পথপ্রদর্শক হিসাবে নারিকেলবাড়িয়ার দিকে রওয়ানা হয়।

এদিকে স্বার্থান্বেষী মহল থেকে সংবাদ রটনা করা হলো যে শেরপুর নীলকুঠির ম্যানেজার মিঃ বেনজামিন বহু লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালাসহ নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণের জন্যে যাত্রা করেছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর তাদেরকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে গোলাম মাসুম তিতুমীর দলের লোকজনসহ সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং বারঘরিয়া গ্রামের জঙ্গল ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রইলো। বজরা এসে বারঘরিয়ার ঘাটে ভিড়লে পরে তিতুমীরের লোকেরা দেখতে পেলো যে, বজরায় দু'জন ইংরেজ এবং তাদের সাথে তাদের পরমশত্রু কৃষ্ণদেব রয়েছে। ইংরেজ দুজনকে তারা ডেভিস এবং বেনজামিন বলে ধারণা করে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলো। কৃষ্ণদেব বল্লো, হুজুর ঐ দেখুন। তিতুমীরের প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুম বজরা আক্রমণ করার জন্যে এতদূর পর্যন্ত এসেছে। সাহেব তখন গুলি চালাবার আদেশ দিলেন। অপরপক্ষও তীর সড়কি চালাতে শুরু করলো। উভয়পক্ষের কয়েকজন হতাহত হওয়ার পর কালেক্টর যুদ্ধ স্থগিত রেখে নদীর

মাঝখানে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

তিতুমীরের দলকে স্বার্থান্বেষী মহল মিথ্যা সংবাদ দিয়ে প্রতারিত করলো। তারা ডেভিস্ ও বেনজামিন মনে করে বজরা আক্রমণ করলো। স্বার্থান্বেষী মহল চেয়েছিল এভাবে তিতুমীরের দলের প্রতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকারকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হলো। প্রকৃত ঘটনা অবগত হলে তারা এভাবে বজরা আক্রমণ করতে আসতোনা। বিশেষ করে কৃষ্ণদেব রায়কে বজরায় দেখে তারা তাদেরকে শত্রুই মনে করেছিল।

মজার ব্যাপার এই যে, বারঘরিয়ার ঘাট থেকে তাড়াতাড়ি বজরায় উঠে নদীর মাঝখানে আত্মরক্ষার সময় কৃষ্ণদেব উঠতে পারেনি। ফলে তার ভাগ্যে যা হবার তা হলো। তবে মুসলমানরা তাকে হত্যা করেনি। নদীতে ডুবে তার অপমৃত্যু ঘটলো।

ইস্ট ইন্ডিয়া সরকারের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংঘর্ষের কোন বাসনা ছিলনা। ঘটনাপ্রবাহ, কতকগুলি অমূলক গুজব এবং এক বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল তিতুমীর ও সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। কতিপয় পাদ্রী, দেশী বিদেশী নীলকর এবং হিন্দু জমিদারদের পক্ষ থেকে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডারের কাছে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অনবরত উত্তেজনাকর রিপোর্ট ও চিঠিপত্র আসতে থাকে। তার সাথে আসে বারঘরিয়ার উক্ত সংঘর্ষের রিপোর্ট। এর ফলে তিতুমীর ও তার দল সম্পর্কে মিঃ আলেকজান্ডারের যে ধারণা জন্মে তাতে তিতুমীরকে দমনের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সম্ভবতঃ রামরাম চক্রবর্তী সংঘর্ষে নিহত হওয়ার পর বশীরহাট থানায় নতুন দারোগা নিযুক্ত হয়। তার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয় যে, সে যেন কতিপয় সিপাই জমাদার নিয়ে নারিকেলবাড়িয়া গিয়ে তিতুমীরকে সাবধান করে দেয়। অতঃপর যা যা ঘটে তার রিপোর্ট যেন দেয়। দারোগা সম্ভবতঃ নারিকেলবাড়িয়া না গিয়ে থানায় বসেই রিপোর্ট দেয় যে, তিতুর লোকজনের আক্রমণে প্রাণ নিয়ে কোনমতে পালিয়ে এসেছে। ফলে আলেকজান্ডারকে কর্তৃপক্ষের কাছে তিতুমীর সম্পর্কে কড়া রিপোর্ট দিতে হয়।

১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর মিঃ আলেকজান্ডার একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং পঞ্চাশজন বন্দুক ও তরবারিধারী সিপাহী নিয়ে নারিকেলবাড়িয়ার তিনক্রোশ দূরে বাদুড়িয়া পৌছেন। বশিরহাটের দারোগা

সিপাই-জমাদারসহ বাদুড়িয়ায় আলেকজান্ডারের সাথে মিলিত হয়। উভয়ের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল একশ' বিশজন। অতঃপর যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় তাতে উভয়পক্ষের লোক হতাহত হয়, গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে মুসলমানদের বীরত্ব দেখে আলেকজান্ডার বিস্মিত হন এবং দারোগা ও একজন জমাদার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। বেগতিক দেখে আলেকজান্ডার প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করেন।

আলেকজান্ডারের রিপোর্ট ও তার প্রতিক্রিয়া

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার বারাসত প্রত্যাবর্তন করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকটে তিতুমীরকে শায়েস্তা করার আবেদন জানিয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার কর্ণেল স্টুয়ার্টকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করে তার অধীনে একশত ঘোড়-সওয়ার গোরা সৈন্য, তিনশত পদাতিক দেশীয় সৈন্য, দু'টি কামানসহ নারিকেলবাড়িয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। ১৩ই নভেম্বর রাত্রে কোম্পানী সৈন্য নারিকেলবাড়িয়া পৌছে গ্রাম অবরোধ করে রাখলো।

শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তিতুমীর ও তাঁর লোকেরা তিতুমীরের হুজরাকে কেন্দ্র করে চারদিকে মোটা মোটা ও মজবুত বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘিরে ফেলেছিলেন যা ইতিহাসে "তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা" বলে অভিহিত আছে।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বের কিছু ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, কর্ণেল স্টুয়ার্ট তিতুমীরের হুজরা ঘরের সম্মুখস্থ প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক ব্যক্তি সাদা তহবন্দ, সাদা পিরহান ও সাদা পাগড়িতে অংগ শোভা বর্ধন করতঃ তসবিহ হাতে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন। স্টুয়ার্ট মুগ্ধ ও বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পথপ্রদর্শক রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্যক্তিই তিতুমীর? একে ত বিদ্রোহী বলে মনে হয় না?

রামচন্দ্র বল্লো, এই ব্যক্তিই বিদ্রোহী তিতুমীর। নিজেকে তিতু বাদশাহ বলে পরিচয় দেয়। আজ আপনাদের আগমনীতে ভংগী পরিবর্তন করে সাধু সেজেছে।

অতঃপর স্টুয়ার্ট রামচন্দ্রকে বল্লেন, তিতুকে বলুন আমি বড়োলাট লর্ড বেন্টিংক-এর পক্ষ থেকে সেনাপতি হিসাবে এসেছি। তিতুমীর যেন আত্মসমর্পণ করে। অথবা তিনি যা বলেন হুবহু আমাকে বলবেন।

রামচন্দ্র তিতুমীরকে বল্লো, আপনি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এখন জপমালা ধারণ করেছেন, আসুন তরবারি ধারণ করে বাদশাহর যোগ্য পরিচয় দিন।

তিতুমীর বলেন, আমি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। হিন্দুদের ন্যায় আমরাও কোম্পানী সরকারের প্রজা। জমিদার নীলকরদের অত্যাচার দমনের জন্যে এবং মুসলমান নামধারীদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানাবার জন্যে সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।

তিতুমীরের জবাব শুনার পর রামচন্দ্র ষ্টুয়ার্টকে দোভাষী হিসাবে বল্লো, বিদ্রোহী তিতুমীর বলছে আত্মসমর্পণ করবে না, যুদ্ধ করবে। সে বলে যে, সে তোপ ও গোলাগুলির তোয়াক্কা করেনা। সে বলে যে, সে তার ক্ষমতা বলে সবাইকে টপ টপ করে গিলে খাবে। সেই এ দেশের বাদশাহ, কোম্পানী আবার কে? (শহীদ তিতুমীর ঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৯৫-৯৬)।

রামচন্দ্র দোভাষীর কাজ করতে গিয়ে কোন্ আগুন জ্বালিয়ে দিল, তা পাঠকমাত্রের বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

তারপর যে যুদ্ধ হলো, তার ফলাফল কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য এবং তাদের ভারি কামানের গোলাগুলির সামনে লাঠি ও তীর সড়কি কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে। তথাপি সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর, গোলাম মাসুম ও তাদের দলীয় লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে অথবা প্রতিপক্ষের কাছে আনুগত্যের মস্তক অবনত না করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধীরস্থির হয়ে যেভাবে শত্রুর মুকাবিলা করে শাহাদতের অমৃত পান করেছেন তা একদিকে যেমন ইতিহাসের অক্ষয় কীর্তিরূপে চির বিরাজমান থাকবে, অপরদিকে অসত্য ও অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামের প্রেরণা ও চেতনা জাগ্রত রাখবে ভবিষ্যতের মানবগোষ্ঠীর জন্যে।

উক্ত ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে Calcutta Review তে একটি বেনামী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে তিতুমীরের সমসাময়িক কোম্পানী সরকারের এই বলে সমালোচনা করা হয় যে, তিতুমীরের রাজদ্রোহিতামূলক কর্মতৎপরতার প্রতি সরকার উদাসীন ছিলেন। এ নিবন্ধকারের মতে তিতুমীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিলাষী ছিলেন। অতএব সরকারের পূর্বাহ্নে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, তিতুমীর এবং তাঁর

মতাবলম্বীগণ কোম্পানী শাসনের অবসান দাবী করে এবং ইংরেজদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে। হান্টারও এরূপ মন্তব্য করেন। (Calcutta Review No. Cl, p. 184 and 179; W. W. Hunter, Bangladesh First Edition 1975, p. 36)।

হান্টার সাহেব হিন্দু জমিদার, নীলকর ও কতিপয় পাদ্রীর অমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগগুলিই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। সাইয়েদ আহমদ শহীদ সম্পর্কেও হান্টার অত্যন্ত জঘন্য ও অশালীন মন্তব্য করেছেন। যথাস্থানে তা আলোচনা করা হবে।

বারাসতের অধীন নারিকেলবাড়িয়ার হাংগামার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্যে J. R. Colvin কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি প্রামাণ্যসূত্রে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যে রিপোর্ট পেশ করেন তা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিশ্চয়তার সাথে বলেন যে, হাংগামাটি ছিল একটি সম্পূর্ণ স্থানীয় ব্যাপার এবং যে সমস্ত অধিবাসী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর সাথে জড়িত ছিল তারা কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলনা। দুই একজন ব্যতীত তারা সকলে ছিল বারাসতের উত্তরাঞ্চলের লোক। তারা ছিল সকলে প্রজা (রায়ত), তাঁতী ও সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান। (Board's Collection, 54222, p. 400; Colvin to Barwell, 8 March 1832, para 4; A R Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal, p. 87)।

কলভিনের উক্ত রিপোর্টের পরে সরকার বিষয়টির প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি।

ডক্টর এ আর মল্লিক Board's Collection এবং Bengal Criminal Judical Consultations-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, কোম্পানীর সৈন্য পরিচালনা করেন মেজর স্কট্। তিতুমীরসহ প্রায় পঞ্চাশজন নিহত হন এবং ২৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মৃতদেহগুলি জ্বালিয়ে ফেলা হয়। তিতুমীরের দলের লোকদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করা হয় এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকেও গ্রেফতার করা হয়। (Dr. A. R. Mallick : British Policy & the Muslms in Bengal, p. 86)।

সর্বমোট ১৯৭ জনের বিচার হয়। তন্মধ্যে গোলাম মাসুমের প্রাণদন্ড, ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ১২৮ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড হয়।

বিচারকালে চারজনের মৃত্যু হয়। ৫৩ জন খালাস পায়।

তিতুমীরের জ্যেষ্ঠপুত্র সাইয়েদ গওহার আলীর দক্ষিণ বাহু গোলার আঘাতে উড়ে যায় বলে তাকে কারাদন্ড থেকে মুক্তি দেয়া হয়। অন্যপুত্র তোরাব আলী অল্পবয়স্ক ছিল বলে তার দু'বৎসর সশ্রম কারাদন্ড হয়। তৎকালীন সরকার পরে নিজেদের ভ্রম বুঝতে পেরে তিতুমীরের তিনপুত্রের জন্যে ভাতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হিন্দুলীগের চেষ্টায় পরে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ১০০)।

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ঘটনা সরকারের জানা থাকলে হয়তো ব্যাপার এতদূর গড়াতোনা। জমিদারদের মুসলিম বিদ্বেষ, মিথ্যা প্রচারণা, দরিদ্র প্রজাবৃন্দের উপর তাদের অসীম প্রভাব এবং তদুপরি দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর একতরফা এবং একদেশদর্শী মনগড়া রিপোর্ট কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত ঘটনা থেকে দূরে রেখেছে। অপরদিকে জমিদার নীলকরদের সীমাহীন অমানুষিক অন্যায় অত্যাচার এবং সরকারের নিকটে বিচার প্রার্থনা করে ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায় প্রতিপক্ষকে চরমপন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। এছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলনা। কল্‌ভিনের রিপোর্টেও এ কথাই বলা হয়েছে। প্রজাবৃন্দের উপর যে কোন উপায়ে অত্যাচার, উৎপীড়ন করার সীমাহীন ক্ষমতা ছিল জমিদারদের। কলভিন এটাকেই হাংগামার মূল কারণ বলে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে এমতাবস্থায়, যেখানে দোষী ব্যক্তি প্রভৃত সম্পদের মালিক, সেখানে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। (A. R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal, p. 88; Board's Collection, 54222, Colvin's Report, para 36)।

একাদশ অধ্যায়

সাইয়েদ আহমদ শহীদের জেহাদী আন্দোলন

সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর জেহাদী আন্দোলন ইতিহাসে ওহাবী আন্দোলন বলে বর্ণিত হয়েছে। কথাটি সম্পূর্ণ সত্যের খেলাপ ও পরিপন্থী। একে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে ইতিহাসের এক অতি বিকৃত তথ্য পরিবেশন। বলতে গেলে ওহাবী আন্দোলন বলে কোন আন্দোলনের অস্তিত্বই পৃথিবীর কোথাও ছিলনা। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজ্‌দী আরবে এক ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর আন্দোলন ছিল একটি নিছক ইসলামী আন্দোলন। এই আন্দোলনকেই বলা হয়েছে ওহাবী আন্দোলন। এ নাম দিয়েছেন ইসলাম বৈরী ইউরোপীয়গণ। একে বলা হয়েছে WAHABISM অথবা WAHABI MOVEMENT. আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম। মুহাম্মদের (সা) দ্বারা প্রচারিত ইসলামকে 'ইসলাম' না বলে তাঁরা বলেছেন 'মুহামেডানিজ্‌ম্‌' এবং মুসলমানকে 'মেহোমেডান' (MEHOMEDAN)। বর্তমান শতকের তিনের দশক পর্যন্ত মুসলমানকে সরকারী ভাষায় MEHOMEDAN বলা হতো। শেরে বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় একটি সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে MEHOMEDAN শব্দ MUSSALMAN অথবা MUSLIM শব্দ দ্বারা পরিবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবের ইসলামী আন্দোলনকে শুধুমাত্র ওহাবী আন্দোলনই বলা হয়নি, বরঞ্চ এর প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে একে চরম ইসলাম বিরোধী বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে। ওহাবী আন্দোলনকে ইসলাম বিরোধী ও 'ওহাবী' শব্দ একটা গালি হিসাবে ইতিহাসে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ প্রচারণার দ্বারা কিছু সংখ্যক মুসলমানও প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়েছে। তাই কাউকে মুসলিম সমাজে হেয় ও ঘৃণিত প্রতিপন্ন করার জন্যে তাকে 'ওহাবী' বলে গালি দেয়া হয়। বিগত প্রায় তিন শতক যাবত একটা চরম ভুলের মধ্যে কিছু লোক নিমজ্জিত হ'য়ে আছেন। অতএব এর বিশেষ আলোচনা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব

আঠোরো শতকের গোড়ার দিকে আরবে যে একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক বা মুজাহিদ জন্মগ্রহণ করেন তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ। পিতার নাম আবদুল ওয়াহ্হাব। আরবের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নামের সাথে পিতার নাম সংযুক্ত করা হয় বলে তাঁর পুরা নাম ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব। ওয়াহ্হাব আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম যার অর্থ পরম দাতা। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব চেয়েছিলেন ইসলামে সবরকম পৌত্তলিক অনুপ্রবেশের মূলোৎপাটন করে খাঁটি তওহীদ বাণীর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং আরবের সবরকম রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগের অবসান ঘটিয়ে শুধু ইসলামী সাম্য ও মৈত্রীনীতির সূত্রে সমস্ত আরবভূমিকে একরাষ্ট্রে বেঁধে দিতে।

তিনি প্রথমজীবনে হজ্ব করতে গিয়ে মক্কা ও মদিনায় মুসলমানদের অনৈসলামিক আচার অনুষ্ঠান দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। আরবের তখন এক বৃহৎ অংশ তুরস্ক সুলতানের শাসনাধীন ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তুর্কীরা বিশেষ করে তুর্কী শাসক শ্রেণী বহু ইউরোপীয় আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিল। সেসব আরব দেশে এমনকি মক্কা-মদিনায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কবরকে কেন্দ্র করে বিরাট বিরাট সৌধ নির্মিত হয়েছিল এবং মুসলমানরা কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক মংগল কামনা করতো। কবরে বাতি দেয়া, ফুলের মালায় শোভিত করা, নজর-নেয়াজ পেশ করা, মানৎ করা—প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ চলতো। এগুলি ছিল পৌত্তলিকতারই অনুকরণ। মওলানা মাসৃউদ আলম নদভী— তাঁর মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী নামক জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তৎকালে আরব দেশে এমন কিছু বৃক্ষ ছিল যেখানে মুসলমানরা পৌত্তলিকদের অনুকরণে একপ্রকার পূজা পার্বণ করতো। এমনকি হিন্দুদের শিবলিংগ পূজা অপেক্ষাও গর্হিত কাজ করতো। মোটকথা ইসলামের এক অতি বিকৃতরূপ দেখে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এ সবের বিরুদ্ধে জোরদার আওয়াজ তোলেন। তিনি প্রথম তাঁর এ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন দামেস্ক শহর থেকে। তুর্কী শাসকশ্রেণীর ইসলাম বিরোধী আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। ফলে শাসকশ্রেণীর কোপানলে পড়তে হয় তাঁকে এবং তিনি দামেস্ক থেকে বিতাড়িত হন। অবশেষে

বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ফিরে আপন জন্মভূমি নজদ্ প্রদেশের দারিয়াহ বা দেরাইয়াহ্ নামক স্থানে আসেন। দারিয়াহ্র সর্দার বা অধিপতি তাঁর সংস্কার আন্দোলন সমর্থন করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন। অতঃপর দারিয়াহ্ অধিপতি মুহাম্মদ বিন সউদের সহায়তায় একাধারে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন এবং আরব লীগ গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন চলতে থাকে।

তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে একথা সত্য যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত ইসলামের পূর্ণ বাস্তবায়নও সম্ভব নয় কিছুতেই। মুহাম্মদ বিন সউদের সাহায্য সহযোগিতায় যে প্রচন্ড রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে যোগদান করেছিল লক্ষ লক্ষ বেদুঈন। তাঁর ফলশ্রুতিস্বরূপ বার বার বিপর্যয়ের ভেতর দিয়েও অবশেষে গোটা আরব দেশ তাদের করতলগত হয়। সউদ বংশের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল সমগ্র আরবভূমিতে এবং তার জন্যেই এ দেশটির পরিচয় হিসাবে বলা হ'য়ে থাকে সউদী আরব। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সার্থকতাই এই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রত্যক্ষ ফল।

উপরে উক্ত হ'য়েছে দারিয়াহ্র অধিপতি মুহাম্মদ বিন সউদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের কন্যাকে বিবাহ করেন। অল্পদিনের মধ্যে মরু অঞ্চলে বিশেষ করে নজদে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর জামাতা মুহাম্মদ বিন সউদের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা অর্পণ করে শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে অর্থাৎ ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সর্বময় কর্তা রয়ে যান। তারপর তুর্কী শাসকদের সাথে বার বার সংঘর্ষ হ'য়েছে। জয়-পরাজয় উভয়ের ভাগ্যেই ঘটেছে। সমগ্র নজদে তাঁদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেকের মতে, চতুর্থ খলীফার আমলের পর এই সর্বপ্রথম কোরআনকে ভিত্তি করে একটি দেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে। অনেকের মতে, যেমন মসৃউদ-আলম নদ্ভী— মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ছিলেন একজন সার্থক মুজাদ্দিদ যিনি তাঁর মুজাদ্দিদিয়াতের বা সংস্কার কাজের পরিপূর্ণ সাফল্য জীবদ্দশায় দেখে গেছেন।

এখন তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আগেই বলা হ'য়েছে যে, তিনি ইসলামের বিপরীত কোন নতুন মতবাদ প্রচার করেননি, যার জন্য তাঁর মতবাদকে ওয়াহ্হাবী মতবাদরূপে আখ্যায়িত

করা যায়। আরব দেশে ওয়াহ্হাবী নামাংকিত কোন মযহাব বা তরীকার অস্তিত্ব নেই। এ সংজ্ঞাটির প্রচলন আরব দেশের বাইরে এবং এই মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষ করে তুর্কী ও ইউরোপীয়ানদের দ্বারা ওয়াহ্হাবী কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। কোন কোন ইউরোপীয় লেখক, যেমন নীবর (Neibuhr) মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবকে পয়গম্বর বলেছেন। এসব উদ্ভট চিন্তারও কোন যুক্তি নেই। প্রকৃত পক্ষে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব কোন মযহাবও সৃষ্টি করেননি। চার ইমামের অন্যতম ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বলের মতানুসারী ছিলেন তিনি এবং তাঁর প্রযত্ন ছিল বিশ্বনবীর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল, সেই আদিম সহজ সরল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা। তাঁর আরও শিক্ষা ছিল, ধর্ম কোন শ্রেণী বিশেষের একাধিকার নয়। কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়াও কোন ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের নয়, কোন যুগ বিশেষের মধ্যেই সীমিত নয়, প্রত্যেক আলেম ব্যক্তির অধিকার আছে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়ার। তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ প্রধানতঃ ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্যদের পুঁথিতে বিধৃত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। যদিও তিনি অনেক বিষয়ে তাদের সংগে একমত নন। —(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ১১৬)।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতি সমূহ, যা তিনি তাঁর 'কিতাবুত্তাওহীদে' সন্নিবেশিত করেছেন, মোটামোটি নিম্নরূপঃ—

১। আল্লাহ্ ছাড়া এমন আর কোন সত্তা বা শক্তি নেই যার এবাদত বন্দেগী, দাসত্ব আনুগত্য, হুকুম শাসন পালন করা যেতে পারে।

২। অধিকাংশ মানুষই তাওহীদপন্থী নয়। তারা অলী দরবেশ প্রভৃতির নিকটে গিয়ে তাদের আশীষ প্রার্থনা করে। তাদের এসব আচার অনুষ্ঠান কোরআনে বর্ণিত মক্কার মুশ্রিকদের অনুরূপ।

৩। এবাদতকালে নবী, অলী, ফেরেশ্তাদের নাম নিয়ে প্রার্থনা করা শির্ক বা বহু দেবতার পূজা অর্চনার মতোই নিন্দনীয়।

৪। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যবর্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করা শির্ক মাত্র।

৫। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানৎ করাও শির্ক।

৬। কোরআন হাদীস এবং যুক্তির সহজ ও অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ ব্যতীত অন্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কুফর।

৭। কদর বা তাক্দীরে বিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ পোষণ নাস্তিকতা।

উপরন্তু যেসব বিদ্আৎ (দ্বীন ইসলামে এমন সব নতুনত্ব যা কোরআন হাদীস সম্মত নয়, অথবা স্বয়ং নবী কর্তৃক প্রবর্তিত নয়), শির্ক ও কুফরের প্রশ্রয় দেয় তিনি সেসবের মূলোচ্ছেদকরণে বিশেষ জোর দেন। তাঁর মৌল শিক্ষাই ছিল লাশরীক আল্লাহ্র প্রতি একান্ত ও অকুণ্ঠ নির্ভরশীলতা এবং স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে যাবতীয় মধ্যস্থতার অস্তিত্ব বা চিন্তার বিলোপ সাধন। যে মধ্যস্থতার নাম করে পীরবাদ বা মুসলমানী ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েম করে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হ'য়েছিল। পীর ও অলীদের প্রতি ও তাদের কবরে মুসলমানের পূজা, এমনকি হযরত মুহাম্মদের (সা) আধাঐশ্বরিক রূপকল্পনার বিলোপ সাধন তিনি করতে চেয়েছিলেন। (এ মতবাদের অনুসরণও মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন,

আহমদের ঐ মিমের পর্দা
রেখেছে তোমায় আড়াল করে।)

কবরে সৌধ নির্মাণ পৌত্তলিকতারই শেষ চিহ্ন মাত্র যে সম্পর্কে আল্লাহর নবী কঠোর ভাষায় সতর্কবাণী করে গেছেন। সেজন্যে সেসব ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়া হ'য়েছিল যাতে করে মুসলমানরা সেগুলিকে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাতে অথবা সেখানে গিয়ে নিজের মংগল কামনা করতে না পারে।

তাঁর এ আন্দোলনের স্বাভাবিক ফল এই ছিল যে, দুইশ্রেণীর মুসলমান অত্যন্ত খড়গহস্ত হ'য়ে পড়ে। এক—কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যারা ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক মংগলকামনা করতো এবং কবরের হেফাজত তথা খেদমতের নামে দর্শনপ্রার্থীদের নিকট থেকে টাকা পয়সা আদায় করে জীবিকা অর্জন করতো। দুই— তুর্কী শাসকগণ। কারণ মক্কা ও মদীনার উপর থেকে তাদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হ'য়েছিল। তুর্কীর সুলতান ছিলেন তখন মুসলিম বিশ্বের স্বমনোনীত খলীফা। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ, বলতে গেলে দুটি মাত্র তীর্থস্থান মক্কা ও মদীনা তাদের হস্তচ্যুত হ'য়ে পড়ায় খেলাফতের দাবী অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। বাহু বলে মক্কা মদীনা পুনরুদ্ধার করা সহজ ছিলনা বলে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের অমূলক ও মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে বিশ্বের মুসলমানদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলা হলো। তুর্কী শাসকদের চরিত্র

যতোই ইসলাম বিরুদ্ধ হোক না কেন, মুসলমানদের খলীফার পক্ষ থেকে যখন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী হলো তখন মুসলমানরা তাই অকপটে বিশ্বাস করলো। এ অপপ্রচারের ফলে ১৮০৩ থেকে ১৮০৬ সাল পর্যন্ত বাইরের দেশগুলি থেকে মক্কায় হাজীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের মতো মুসলমানদের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন বাংলা ভারতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, তিতুমীর, প্রভৃতি মনীষীগণ। ব্রিটিশ সরকার এবার তাঁদের স্বার্থে এসব মনীষীকে ওয়াহ্হাবী বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মাতলেন। এর চেয়ে সত্যের অপলাপ ও নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে?

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ বলেনঃ—

একবার যদি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিধর্মী বিদ্বেষ জাগরিত হয় তাহা হইলে এশিয়া ও আফ্রিকায় তাহাদের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙিয়া পড়িবে আশংকা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ইসলামের জন্য মায়াকান্না শুরু করিয়া দেন। তাই দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যখনই কোন মুসলমান দেশপ্রেমিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন তখনই ইংরেজরা তাহাকে 'ওহাবী' আখ্যা দিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ প্রদান ও বিকল্পে নির্যাতনের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বশংবদ আলেমদের নিকট হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে ফতোয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন, তুর্কীদের বেতনভুক শেরিফের আজ্ঞাবহ কর্মচারীর নিকট হইতে নিজেদের জন্য সার্টিফিকেট আনাইয়াছেন। এমনকি, খাস আরব দেশ হইতেও প্রচারক আনিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নিজেদের রচিত অলীক কাহিনী তাহার মুখে প্রচার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকে দিয়া তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সাহায্যে প্রতি জেলায় 'আনজুমনে ইসলামিয়া', 'হেজবুল্লাহ সমিতি' ও 'আনজুমনে এশায়াতে ইসলাম' প্রভৃতি কায়েম করাইয়া দেশপ্রেমিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে উহাকে ব্যবহার করাইয়াছেন।. . .ইহার বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে জান্নাতে ফেরদৌস বখ্শিশ করেন কিনা বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, এই ইসলাম রক্ষা অভিযানে তাহারা শত শত

মুসলমানকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাইয়া অথবা সুদূর আন্দামানে নির্বাসনে পাঠাইয়া অন্ততঃপক্ষে তাহাদের পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারিয়াছে। (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, পৃঃ ৬০-৬১)।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ও তদীয় জামাতা মুহাম্মদ বিন সউদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উত্থানপতনের ঘটনাপঞ্জী

১৭০৩ খৃঃ— মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের জন্ম আরবের উয়াইনা অঞ্চলে তামিম গোত্রের শাখা বানু সিনান বংশে।

১৭৪৭ খৃঃ— রিয়াদের শেখের সাথে সংঘর্ষ

১৭৭৩ খৃঃ— রিয়াদের শাসক দাহ্হাম পরাজিত।

১৭৮৭ খৃঃ— মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের এন্তেকাল।

১৭৯১ খৃ— মক্কা আক্রমণ

১৭৯৭ খৃঃ— এশিয়ার সমগ্র তুর্কী অধিকার মুহাম্মদ বিন সউদের পৌত্র সউদের হাতে।

১৮০৩ খৃঃ— মক্কা দখল।

১৮০৪ খৃঃ— মদীনা দখল।

১৮০৬ খৃঃ— মক্কা পুনর্দখল।

১৮১১ খৃঃ— উত্তরে আলেপ্পো থেকে ভারত মহাসাগর এবং পারস্য উপসাগর ও ইরাক সীমান্তের পরবর্তী পূর্বে লোহিত সাগর পর্যন্ত সউদের হাতে।

১৮১১ খৃঃ— মিসরবাহিনী মদীনা দখল করে।

১৮১২ খৃঃ— মিসরবাহিনী মক্কা দখল করে।

১৮১৪ খৃঃ— সউদের মৃত্যু।

১৮১৮ খৃঃ— দারিয়াহ্র রাজধানী বিধ্বস্ত হয়।

১৯০৪ খৃঃ— পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভ। সউদ পৌত্র আবদুল আযীয বিন আবদুর রহমান নজ্‌দে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯২৪ খৃঃ— মক্কা দখল।

১৯২৫ খৃঃ— মদীনা ও জেদ্দা অধিকার করেন।

এভাবে প্রায় সমগ্র জাজিরাতুল আরব (কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমীরি অধিকার ব্যতীত) সউদী আরব নামাংকিত আরবী জাতীয় রাষ্ট্রে রূপায়িত হয় যা এখনো

বিদ্যমান। (ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ পৃঃ ১১২–১৫ দ্রঃ)।

হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাও উদ্ধৃত করা হলো।

রক্তের অক্ষরে তাঁরা যে নীতিমালা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা ছিল মহান। সর্বপ্রথম তাঁরা যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন, তা হলো এই যে, তুর্কীরা তাদের ইন্দ্রিয় পরায়ণতার দ্বারা পবিত্র নগরীকে (মক্কা) কলুষিত করেছিল। বহুবিবাহেও তারা পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। হজ্বে আগমন কালে তারা সংগে নিয়ে আসতো জঘন্যতম চরিত্রের স্ত্রীলোক এবং তারা এমন সব কুকর্মে লিপ্ত হতো যেগুলি কোরআনে নিষিদ্ধ ছিল সম্পূর্ণরূপে। পবিত্র নগরীর রাজপথে তারা প্রকাশ্যে মদ ও আফিম খেতো। তুর্কী তীর্থ যাত্রীদল মক্কার পথে ঘৃণ্যতম লাম্পট্যের আচরণ করতো। মুহাম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহ্হাব সর্বপ্রথম এসব জঘন্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ তোলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর মতামতগুলি একটি ধর্মীয় মতবাদের রূপ ধারণ করে এবং ওয়াহ্হাবী মতবাদ নামে বিস্তার লাভ করে।(১) ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই এখন এ মতাবলম্বী। এ মতবাদ অনুসারে মুহাম্মদের প্রবর্তিত ধর্মকে বিশুদ্ধ আস্তিকতায় পরিণত করা হ'য়েছিল এবং সাতটি নীতির উপরে তা ছিল স্থাপিত। এক—এক আল্লাহ্‌তে অবিচল আস্থা। দুই—স্রষ্টা ও মানুষের মাঝখানে কোন মধ্যস্থতাকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার। অলী দরবেশদের নিকটে প্রার্থনা করা, এমনকি মুহাম্মদের আধা ঐশ্বরিক রূপকল্পনাও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তিন—মুসলমানী ধর্মগ্রন্থের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার অধিকার এবং পবিত্র গ্রন্থের ধর্মযাজকসুলভ ব্যাখ্যা বর্জন। চার—মধ্য ও আধুনিক যুগের মুসলমান যেসব রসম রেওয়াজ ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান পবিত্র তাওহীদ বিশ্বাসের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করা। পাঁচ—যে ইমামের নেতৃত্বে প্রকৃত ঈমানদারগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত হবে তাঁর প্রতীক্ষা। ছয়—সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগ্রাম করা যে অবশ্য কর্তব্য তা তত্ত্বগত ও বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বদা স্বীকার করা। সাত—আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য।

(১) 'ওয়াহ্হাবী' বা 'ওহাবী' পরিভাষাটি বহির্জগতের বিশেষ করে ইউরোপীয়দের কল্পনা রাজ্যের সৃষ্টি।

হান্টারের মতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের প্রচেষ্টায় মুহাম্মদের প্রবর্তিত ধর্মকে (অর্থাৎ ইসলামকে) বিশুদ্ধ আস্তিকতায় পরিণত করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইসলামের ভিতরে অধর্ম বিধর্ম ও পৌত্তলিকতার যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা থেকে ইসলামকে মুক্ত করে সত্যিকার ইসলামী রূপ ও আকৃতি ফিরে আনাই ত তাঁর কাজ ছিল। এতে তিনি প্রকৃত ইসলামের সেবাই করেছেন। এইত প্রকৃত মুসলমানের কাজ। ইসলামের বিকৃত রূপকে পরিবর্তন করে তার প্রকৃত রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ত যুগে যুগে সংস্কারক আগমন করার ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের নবী করে গেছেন যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাদ্দিদ' বলা হ'য়েছে। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপকে ইসলাম বিরোধী ও মতবাদকে ইসলাম থেকে পৃথক মতবাদরূপে গণ্য করে 'ওহাবী' মতবাদে আখ্যায়িত করা হলো কেন? ইউরোপীয়দের এবং ভ্রান্তির গহীন সাগরে নিমজ্জিত একশ্রেণীর মুসলমানদের কাছে এর কী জবাব আছে? ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের চিরকালের বিদ্বেষাত্মক মনোবৃত্তির দরুন এমন করতে পারেন। এটা তাঁদের স্বভাবসুলভ— এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু ইসলামকে বিকৃত করে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পৌত্তলিক ও অনৈসলামী আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার আমদানী করে তাকে একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মে পরিণত করে যারা তাদের ব্যবসার বাজার জমজমাট করে রেখেছিল এবং এখনো রাখে, তাদের কাছে সত্যিই এর কোন জবাব নেই। চরিত্রহীন ও লম্পট তুর্কী শাসকরা এবং তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট ও উচ্ছিষ্টভোজী অনুচরবৃন্দ সর্বপ্রথম এই শ্রেষ্ঠ সাধক ও মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার শুরু করেন। অতঃপর ব্রিটিশ ভারতে যখন অনুরূপ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন সাইয়েদ আহমদ বেরেল্‌ভী, তখন স্বার্থান্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ তাঁকে 'ওহাবী' নামে আখ্যায়িত করে ভাড়াটিয়া আলেম নামধারী লোকদের দ্বারা তাঁর উপরে ফতোয়ার মেশিনগান থেকে অবিরাম ধারায় গোলাগুলী বর্ষণ করতে থাকে। তবে সাইয়েদ আহমদের জিহাদী আন্দোলন চলাকালে এসব মেশিনগানের গুলীগোলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'য়েছে। তাই হান্টার বলেছেন 'ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই এখন এ মতাবলম্বী'।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ

বাদশাহ আওরঙজেব আলমগীরের মৃত্যুর চার বৎসর পূর্বে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দিল্লী নগরীতে এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ আবদুর রহীম ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের (রা)বংশধর।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর পিতা শাহ্ আবদুর রহীমের নিকটে। পরে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বার বছর যাবত শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি আরবে গমন করেন এবং মক্কা মদীনায় সুদীর্ঘকাল কাটান। মক্কা মদীনা অবস্থানকালে শাহ্ সাহেব ইজতেহাদের উপযোগী গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করেন। শিবলী বলেন, ইবনে রুশদ্ ও ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পর মুসলিম জগতের যে চরম অবনতি ঘটেছিল, তাকে পুনরায় উজ্জীবিত করেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ)। দীর্ঘকাল যাবত কোরআন-হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বিশেষ করে মক্কা মদীনা সফরের ফলে লব্ধ প্রেরণাই তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার জন্যে সচেষ্ট করে তুলেছিল।

আওরঙজেবের মৃত্যুর পর যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে ধীরে ধীরে মোগল সাম্রাজ্য তথা ভারতে মুসলিম সুলতানাত ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল এবং ইংরেজ বণিক বেশে এ দেশে আগমন করে ক্রমশঃ এ দেশের মালিক-মোখতার হ'য়ে গেল, এসব কিছুর পট পরিবর্তন হলো শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র চোখের সামনে। এ দৃশ্য শাহ্ সাহেবকে অত্যন্ত ব্যথিত ও পীড়িত করেছিল। তিনি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের এ অধঃপতনের প্রধান কারণ হলো তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন।

ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ ও চিন্তা গবেষণার ফলে তাঁর মনোজগতে ইসলামী রাষ্ট্রের এক রূপরেখা প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু তিনি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃত যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত শুধু বাহুবলে কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর যদি তা কখনো সম্ভবও হয়, তাকে টিকিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সত্যিকার ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের লোক তৈরী হলো

পূর্বশর্ত। কিন্তু এ ধরনের গুণাবলী ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের শুধু অভাবই ছিল না, বরঞ্চ মুসলমানরা নানাবিধ জাহেলী বা অনৈসলামী কুসংস্কার জালে ছিল আবদ্ধ। এ বেড়াজাল থেকে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করার জন্যে তিনি সর্বপ্রথমে আত্মনিয়োগ করলেন ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে। তাঁর আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সংস্কার সাধন করে ইসলামকে তার প্রাথমিক পবিত্রতা ও জীবনীশক্তিতে ফিরিয়ে আনা এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করে পুনরায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা। এ জন্যে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ আরবের মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাবের ন্যায় মুসলমানদের অনৈসলামী রীতি-নীতি, কুসংস্কার ও অনাচারের মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করেন।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ লক্ষ্য করেছিলেন, শরীয়তে-ইসলামের প্রতি তাসাওউফপন্থী সূফীদের উদাসীনতা ও অবজ্ঞা ইসলাম ও মুসলিম সমাজের জন্যে ছিল ক্ষতিকর, তাদের আচরিত বহু অনাচারের ও প্রচারিত ইসলাম বিরুদ্ধ মতবাদের অনুপ্রবেশ মুসলিম ধর্ম জীবনকে করে রেখেছিল কলুষিত ও বিকৃত। ব্যবসায়ী সূফীদের প্রাদুর্ভাব ও পীরপূজা-কবরপূজার প্রথাও ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। ওয়ালিউল্লাহ্ অবশ্য তাসাওউফের উচ্ছেদ চাননি, তিনি চেয়েছিলেন তার পূর্ণ সংস্কার ও পরিশুদ্ধি। তিনি সূফীবাদকে সংস্কার করে তাকে করতে চেয়েছিলেন কল্যাণমুখী। পেশাদার পীর, ফকীর, কবরপূজা, কেরামতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার ওসিয়তনামায় বহু অকাট্য যুক্তি ও নির্দেশ আছে।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ এক শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব পরিবেশে লোকচরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সংস্কার আন্দোলন বা গঠনমূলক কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে একাধারে মুসলিম সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি ও কুসংস্কারগুলির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেন এবং অপর পক্ষে তাদের সঠিক কর্মপন্থাও সুস্পষ্ট করে তোলেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে ফত্হুল কবীর, 'হুজ্জাতুল্লাহেল্ বালেগা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মৃত, ঘুমন্ত ও পথভ্রষ্ট জাতিকে লেখনীর বেত্রাঘাতে জীবন্ত ও জাগ্রত করে সঠিক পথে চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এ প্রতিভাবান মনীষী ইহলোক ত্যাগ করেন।

শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র এন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয (১৭৪৬-১৮২৩ খৃঃ) তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে সম্মুখে অগ্রসর হন। ভারতীয় আলেম সমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ দেশকে নির্ভয়ে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া জারী করেন। বিধর্মী ইংরেজ শাসিত দেশে মুসলমানদের সামাজিক ও দ্বীনি অবস্থা কী হবে— এ প্রশ্নটি মুসলমানদের মনমস্তিষ্ককে আলোড়িত করে রেখেছিল। বীর মুজাহিদ শাহ্ আবদুল আযীয উদাত্ত কণ্ঠে ও অকুতোভয়ে ঘোষণা করলেন যে, অনৈসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাধীন ভারত হ'চ্ছে 'দারুল হরব'। এখানে নিশ্চিন্তে ও সন্তুষ্টচিত্তে মুসলমানদের বসবাস করা ঈমানের পরিপন্থী। হয় তাদেরকে জেহাদ করে এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে, অন্যথায় হিজরত করে অন্যত্র গমন করতে হবে। তাঁর এ ঘোষণা মুসলমানদের মনেপ্রাণে জেহাদের এক দুর্দমনীয় প্রেরণার হিল্লোল প্রবাহিত করে।

স্বৈরাচারীর প্রভাব থেকে মুসলিম ভারতকে মুক্ত করার আকুল আগ্রহে শাহ্ আবদুল আযীয প্রবর্তন করেন 'তারগীবে মুহাম্মদীয়া' নামে সমাজ সংস্কারক আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল— যেসব ইসলাম বিরুদ্ধ রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে তার মূলোচ্ছেদ করে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এক সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শাহ্ সাহেব, সারা ভারতে এ আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং এ কাজে নিয়োগ করেন তাঁরই নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল নিঃস্বার্থ ও অক্লান্তকর্মা লোক। কালক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ 'তারগীবে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন একটি জিহাদী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং অত্যাচারী শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে আযাদীর আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী এবং তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন শাহ সাহেবের ভাইপো শাহ্ ইসমাইল শহীদ ও জামাতা মওলানা আবদুল হাই।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র বংশ তালিকা

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬২ খৃঃ)

- শাহ্ আব্দুল আযীয
- শাহ্ রফীউদ্দীন
- শাহ্ আবদুল কাদের
- শাহ্ আবদুল গনী

- মওলানা আব্দুল হাই (জামাতা)
  - মওলানা ইসহাক
  - মওলানা ইয়াকুব
- শাহ মাহফুজুল্লাহ্
- শাহ্ ইসমাইল
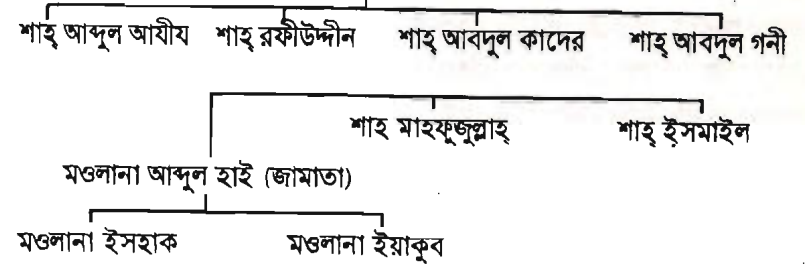
সাইয়েদ আহমদ শহীদ

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠে। এ আন্দোলন পরিচালিত হ'য়েছিল একমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারাই। এ আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহ)। এ আন্দোলনকে ইতিহাসে 'ওহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যায়িত করা হ'য়েছে অথচ এ ছিল একাধারে ইসলামী ও আযাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আসমুদ্রহিমাচলে একটি অখন্ড স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কিন্তু কতিপয় লোকের চরম বিশ্বাসঘাতকতার দরুন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। তথাপি এ আন্দোলন আগাগোড়া যেরূপ গোপনে ও সুনিপুণ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়, তা কল্পনাকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দেয়।

সাইয়েদ আহমদ ৬ই সফর ১২০১ হিজরী (ইং ১৭৮৬) এলাহাবাদের রায় বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনী লেখকগণ তাঁর জন্ম সংক্রান্ত এক বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পুণ্যময়ী জননী স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর রক্তে লেখা একখানি কাগজ পত পত করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর জনৈক নিকটআত্মীয় স্বপ্নের কথা শুনে বল্লেন, চিন্তার কারণ নেই। আপনার গর্ভ থেকে যিনি জন্মগ্রহণ করবেন তিনি হবেন ইতিহাসের একজন অতি খ্যাতনামা ব্যক্তি। —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৫৬)।

এ স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর অনুসারীদের তাজা খুনে বাংলাদেশ থেকে বালাকোট পর্যন্ত ভারতভূমি রঞ্জিত হয়েছে। তাঁদের সে রক্তলেখা স্মৃতি পরবর্তী এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত মুসলমানদেরকে অবিরাম জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে— বিদেশী ও বিধর্মী শাসন-শোষণের নাগপাশ থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করে।

সাইয়েদ আহমদের বয়স যখন চার বৎসর চার মাস চারদিন তখন সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে মকতবে পাঠানো হয়। কিন্তু শিশু সাইয়েদ আহমদের শিক্ষার প্রতি কোন অনুরাগই ছিল না।

গোলাম রসূল মেহের বলেন, শৈশবে কেন যে তিনি শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন তা বলা মুশকিল। তবে পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, তিনি ফারসী ভালোমত রপ্ত করে ফেলেছিলেন এবং অনর্গল এ ভাষায় কথা বলতে পারতেন। আরবী ভাষাও এতটা শিখেছিলেন যে "মেশকাতুল মাসাবীহ্" নিজে নিজেই পড়তে পারতেন। 'হাফেজ', 'বেদেল' এবং অন্যান্য কবিদের কবিতা বলতে পারতেন। কিন্তু তথাপি পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁর বাল্যশিক্ষা সন্তোষজনক ছিল না। তাঁর বড়ো ভাই সাইয়েদ ইব্রাহীম ও সাইয়েদ ইসহাক তাঁর পড়াশুনার জন্যে যথেষ্ট তাকীদ করতেন। কিন্তু পিতা নৈরাশ্য সহকারে বলতেন, "বিষয়টি তার উপরেই ছেড়ে দাও।"

পরবর্তীকালে তিনি দিল্লী গমন করলে, শাহ্ আবদুল আযীয আকবরাবাদী মসজিদে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর শিক্ষার জন্যে শাহ আবদুল কাদেরকে নিযুক্ত করেন। সাইয়েদ আহমদ তাঁর কাছে আরবী ও ফার্সী শিক্ষা করতেন। একথা ঠিক যে, শাহ ইসমাইল অথবা মওলানা আবদুল হাই এর মতো বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা তিনি লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু আরবী ও ফার্সী বলতেও পারতেন এবং সহজেই বুঝতে পারতেন।

মৌলভী সাইয়েদ জাফর আলী নক্ভী বলেন, শাহ্ ইসমাইল প্রতিদিন ফজর নামাজের পর হাদীস ব্যাখ্যা করে শুনাতেন। সাইয়েদ সাহেবও কোন কোন হাদীসের গুরুত্ব বর্ণনা করতেন এবং শ্রোতাগণ এর থেকে বিশেষ উপকৃত হতেন। —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৫৬,৭১,৭৩)

বাল্যকাল থেকেই সাইয়েদ আহমদ শরীর চর্চায় অভ্যস্থ ছিলেন এবং তিনি ছিলেন অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী। শৈশবকাল থেকে তাঁর মধ্যে জেহাদের প্রেরণা জাগ্রত ছিল এবং তিনি প্রায় সমবয়সীদের সামনে বলতেন 'আমি জেহাদ করব' 'আমি জেহাদ করব।' সকলেই এটাকে শিশুসুলভ প্রগল্ভ উক্তি মনে করতো। কিন্তু তাঁর মা শিশুর এ উক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। গোলাম রসূল মেহের 'তাওয়ারিখে আজমিয়ার' বরাত দিয়ে বলেন, বালক সাইয়েদ আহমদ বস্তীর বালকদের মধ্য থেকে একটি 'লশকরে ইসলাম' দল গঠন করতেন এবং উচ্চস্বরে জেহাদী শ্লোগানসহ একটি কল্পিত 'লশকরে কুফফার' এর উপর আক্রমণ চালাতেন এবং 'ইসলামী সেনাদল' জয়লাভ করলো এবং 'কাফের সেনাদল' হেরে গেল বলে চীৎকার করে আকাশ বাতাস মুখরিত করতেন। —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৫৯)।

এভাবে একদিকে 'ইসলামী সৈন্য' এবং অপরদিকে 'অমুসলিম সৈন্য' কল্পনা করে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ চালিয়ে বাল্যকাল থেকেই সাইয়েদ আহমদ জেহাদীমনা হয়ে গড়ে উঠেছিলেন যার প্রতিফল ঘটেছিল পরবর্তীকালে তাঁর বাস্তবজীবনে।

আঠারো বৎসর বয়সে সাইয়েদ আহমদ আটজনের একটি দলসহ লক্ষ্ণৌ গমন করেন। অন্যান্যদের উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা অন্বেষণ করা। কিন্তু সাইয়েদ সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। চার মাস লক্ষ্ণৌ অবস্থানের পর তিনি সাথীদেরকে চাকুরীর বাসনা পরিত্যাগ করে দিল্লীতে ইমামুল হিন্দ শাহ্ আবদুল আযীযের নিকটে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। অতঃপর পায়ে হেঁটে কয়েকদিনের মধ্যে শাহ্ সাহেবের দরবারে উপনীত হন এবং তাঁর হস্তে বয়আত গ্রহণ করে মুরীদ হন।

উপরে বর্ণিত হয়েছে, আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থান করতঃ সাইয়েদ আহমদ একাধারে কোরআন হাদীস ফেকাহ প্রভৃতিতে জ্ঞান লাভ এবং শাহ্ আবদুল আযীযের নিকটে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করতে থাকেন। এভাবে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে পাঁচ বৎসর পর সাইয়েদ আহমদ তাঁর জন্মস্থান রায় বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তিনি তেইশ বছরে পদার্পণ করেছেন মাত্র। এ সময়ে তিনি সাইয়েদা যোহ্রা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বালিকাকে বিবাহ করেন। পরের বছর তিনি একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। কিন্তু শৈশবকাল থেকেই যে

জেহাদী প্রেরণা তিনি হৃদয়ে পোষণ করছিলেন, সে প্রেরণা তাঁকে ঘরের মায়া মোহ ও প্রেমে বেঁধে রাখতে পারলো না। তিনি গৃহ ত্যাগ করে নবাব আমীর খানের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমীর খানকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর সহায়তায় একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করবেন। তিনি সাত বছর আমীর খানের সেনাবাহিনীতে থাকার পর নিরাশ হয়ে তাঁর সংগ পরিত্যাগ করেন। যাদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদের পরিকল্পনা, সেই ইংরেজদের সাথে সন্ধিসূত্রে আমীর খান আবদ্ধ হলেন বলে তাঁর আশা-আকাংখা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তিনি শাহ্ আবদুল আযীযের নিকটে যে পত্র দেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

"এখানে সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। নবাব সাহেব ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়েছেন। এখানে থাকার আর কোন উপায় নেই।" — (সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ১০৯)।

নবাব আমীর খানের সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করে সাইয়েদ সাহেব পুনরায় শাহ্ আবদুল আযীযের খেদমতে হাজীর হন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল মুসলমানদেরকে সত্যিকার মুসলমান হিসাবে গড়ে তোলা, প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে যে ধরনের জেহাদী প্রেরণা জাগ্রত ছিল তা পুনর্বার উজ্জীবিত করা এবং ভারতে একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা।

সাইয়েদ সাহেব আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে এতো উচ্চস্থান অর্জন করেছিলেন যে, মৌলভী মুহাম্মদ ইউসূফ, শাহ ইসমাইল ও মওলানা আবদুল হাই এর মতো শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ খান্দানের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁর হস্তে বয়আত গ্রহণ করেন। এর পর থেকে দলে দলে লোক তাঁর মুরীদ হতে থাকেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে যে জেহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন তার লক্ষ্য হলো সত্যের পথে সংগ্রাম করে আল্লাহ প্রদর্শিত সরল ও সঠিক পথে চলা। এ পথেই তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে আজীবন পরিচালনা করেন।

শাহ ইসমাইলের নিকটে লিখিত এক পত্রে জেহাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তিনি বলেন—

"জেহাদের উদ্দেশ্য ধন সম্পদ অর্জন অথবা খ্যাতি অর্জন করা নয়। বিভিন্ন অংশ জয় করা বা স্বীয় স্বার্থ পরিতৃপ্ত করা অথবা নিজের জন্য একটা রাজ্য স্থাপন করাও জেহাদের উদ্দেশ্য নয়। জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে

সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তাকে বিনষ্ট করা।" —(স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ৮৩)

সত্যিকার অর্থে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত না মুসলিম সমাজের কুসংস্কার ও অনৈসলামী আচার অনুষ্ঠান দূর করা সম্ভব, আর না খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

এমন মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য যাঁর, যাঁর চরিত্র ছিল নির্মল ও নিষ্কলুষ, যিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বার্থের বহু উর্ধে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁর সম্পর্কে হান্টার বলেন— "এই বিস্ময়কর প্রভাবের উৎপত্তি কেবলমাত্র অশুভ ভিত্তির উপরেই ঘটেনি, সাইয়েদ আহমদ ধর্মীয় নেতা হিসাবে তাঁর জীবন আরম্ভ করেছিলেন দুটি মহান নীতির প্রবক্তা রূপে। নীতি দুটি হচ্ছে খোদার একত্ব এবং মানুষের সাম্য। সত্যিকার ধর্মপ্রচারকরা সকলেই এই দুই নীতি অনুসরণ করে থাকেন। দেশবাসীর অন্তরে যে ধর্মভাব দীর্ঘকাল যাবত সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত হিন্দু ধর্মের সাহচর্যের দরুন সৃষ্ট কুসংস্কার অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানদের মনকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এবং ইসলাম ধর্মকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল, সাইয়েদ আহমদ এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নাড়া দিয়েছিলেন মুসলমানদের সেই ধর্মনিষ্ঠ মনের দুয়ারে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রতিমা পূজার আনুষ্ঠানিকতায় সমাহিত হয়েছে। সাইয়েদ আহমদ একজন দুর্বৃত্ত দস্যু (Bandit) ছিলেন। তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যবর্গ ভণ্ডের (Imposters) দলে পরিণত হয়েছিলেন একথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও আমি একথা বিশ্বাস না করে পারি না যে, সাইয়েদ আহমদের জীবনে অন্তর্বর্তী এমন একটা সময় ছিল, যখন সর্বান্তঃকরণে বেদনাকুল হৃদয়ে তিনি তাঁর দেশবাসীর মুক্তি কামনা করেছিলেন এবং তাঁর অন্তর নিবদ্ধ হয়েছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি।"

[W.W. Hunter, The Indian Mussalmans— অনুবাদ আনিসুজ্জামান (কিছু পরিবর্তনসহ) পৃঃ ৩৬]

হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে কিরূপ স্ববিরোধী উক্তি করেছেন তা যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারবেন। যে ব্যক্তির 'অন্তর নিবদ্ধ হয়েছিল আল্লাহ্‌র প্রতি' যিনি 'সর্বান্তঃকরণে বেদনাকুল হৃদয়ে তাঁর দেশবাসীর মুক্তি কামনা করেছিলেন, তাঁকে হান্টার বলেছেন দস্যু-দুর্বৃত্ত এবং ভণ্ড।

হান্টার সাহেব আরও বলেন, "ধর্মীয় ধ্যানে তিনি এমন মগ্ন থাকতেন যে, সেটাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে মৃগীরোগ বলে অভিহিত করা যায়।" (ঐ, ঐ)

আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকাকে তাসাওউফের পরিভাষায় বলা হয় মুরাকাবা-মুশাহাদা। হান্টারের মতো খোদায় অবিশ্বাসী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন মৃগীরোগ। ইসলাম বিদ্বেষব্যাধি মনমস্তিষ্ককে কতখানি আক্রান্ত করে রাখলে এ ধরনের অশালীন উক্তি করা যায়, তা সহজেই অনুমেয়। সাইয়েদ আহমদ যদি শুধুমাত্র 'ধর্মীয় ধ্যানে মগ্ন' থাকতেন, তাহলে সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য লেখকগণ তাঁর কোন বিরূপ সমালোচনা করতেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি বিধর্মী ও বিদেশী শাসন থেকে 'দেশবাসীর মুক্তি কামনা করেছিলেন', সেজন্যে তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'মৃগী রোগাক্রান্ত', দুর্বৃত্ত ও ভন্ড। এ ছিল তাদের বিদ্বেষদুষ্ট ও বিকৃত মানসিকতারই পরিচায়ক।

শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর ভাইপো প্রখ্যাত আলেম শাহ ইসমাইল এবং জামাতা মওলানা আবদুল হাই, সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ হওয়ার ফল এই হলো যে, সাইয়েদ সাহেবের খ্যাতি বিদ্যুৎ গতিতে মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিক থেকে জনসাধারণ তাঁকে দাওয়াত করতে থাকলো এবং তিনি তাঁর মুর্শেদ শাহ আবদুল আযীযের অনুমতিক্রমে দোয়াব অঞ্চলের গাযিয়াবাদ, মীরাট, মজফফরপুর, সাহারানপুর, দেওবন্দ প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপক সফর করেন। প্রায় চল্লিশ হাজার লোক তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং বহু অমুসলমানও তাঁর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাঁর এ সফরকালে তিনি শিখদের হাতে মুসলমানদের নির্যাতন কাহিনী প্রথম শুনতে পান এবং তাঁর অন্তর সমবেদনায় বিগলিত হয়। ১৮১৯ সালে তিনি শেষবারের মতো দিল্লী ফিরে যান এবং অল্পকাল পরেই রায়বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন।

রায়বেরেলীতে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেখানে এই খোদাভক্তদের জীবনযাত্রা ছিল আদর্শস্থানীয় এবং দর্শকদের শিক্ষার যোগ্য। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে প্রায় সত্তর আশীজন লোক সায় নদীর তীরবর্তী সাইয়েদ বংশের পুরাতন মসজিদের চারধারে নিজ হাতে কুটীর তৈরী করে বাস করতেন। সে বৎসর (১৮১৯ খৃঃ) গ্রীষ্মকালে জোর বৃষ্টি নামলো এবং নদীগুলোতে প্রবল প্লাবন এলো। খাবার হয়ে পড়লো দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব নির্বিকার চিত্তে তাঁর

আশিজন খোদাপ্রিয় ও খোদাভক্ত সংগী নিয়ে এবাদত বন্দেগীতে, লোকসেবা ও প্রচার কার্যে দিনরাত ব্যস্ত রইলেন। তাঁর তখনকার কর্মব্যস্ততায় হযরত ঈসার (আ) 'সারমন অব দি মাউন্টের' বিখ্যাত উপদেশাবলীর আক্ষরিক প্রতিপালনই লক্ষ্য করা যায় ঃ তোমার নিজের জীবনে কি খাবে ও কি পান করবে সে বিষয়ে কোন চিন্তা করোনা— এমনকি দেহের চিন্তাও করোনা যে, কি পরবে। কিন্তু আল্লাহর প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর, তাহলে তোমার এ সবই হবে।

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ১৫৪-৫৫)

উপরোক্ত দলে ছিলেন ইসলাম জগতের বহু জ্ঞান-জ্যোতিষ্ক যথা হুজ্জাতুল ইসলাম মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল, শায়খুল ইসলাম মওলানা আবদুল হাই, কোতব-ই-ওয়াক্ত মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ প্রভৃতি। শাহ ইসমাইল তাঁর অসীম জ্ঞানগরিমা ও পান্ডিত্যসহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপন পীর ও মুর্শেদের সাথে ছায়ার মতো ছিলেন এবং তাঁর সংগেই শাহাদতের অমৃত পান করেন। প্রাতঃকালে প্রচারণা, ওয়াজ নসিহত, কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যাদান, দিবাভাগে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম এবং সারারাত তাহাজ্জুদ ও এবাদত বন্দেগীতেকাটানো— এ ছিল এসব খোদাপ্রেমিকদের দৈনন্দিন কর্মসূচী।

সাইয়েদ সাহেবের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম থেকে ভন্ডামী ও জাঁকজমক দূর করা এবং জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিশ্বনবীর সহজ সরল জীবনধারা অনুসরণ করা। ধর্ম বিশ্বাসে তিনি ছিলেন পুরাপুরি তাওহীদপন্থী, আল্লাহর সার্বভৌমত্বে অকুণ্ঠ বিশ্বাসী, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সুন্নাহ্‌র একনিষ্ঠ পাবন্দ্। সব রকম শির্ক থেকে দূরে থাকা, যেমন পীর আউলিয়ার কাছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মংগল কামনা, গায়েবী মদদ প্রার্থনা করা, বিভিন্ন প্রকারের কবর পূজা করা, পৌত্তলিক ও অন্যান্য বিধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা, প্রভৃতি। তিনি ইসলামকে নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করার চেয়ে প্রকৃত সাধু জীবন যাপনের দিকেই বেশী জোর দিতেন— কারণ তার ফলেই মানুষ একটা মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্‌রই করুণার উপরে হয় নির্ভরশীল। একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, তিনি নিজের ইচ্ছা ও আশা-আকাংখাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মরযীর উপরে একান্তভাবে সুপর্দ করেছিলেন, যার জন্যে তিনি তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহরই ইচ্ছানুযায়ী চলতে প্রস্তুত থাকতেন।

সাইয়েদ সাহেব তাঁর অভীষ্ট পথে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে হজ্বে বায়তুল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর সাথে পবিত্র হজ্বে শরীক হওয়ার জন্যে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ তাঁর পাশে জমায়েত হতে লাগলো। ১২৩৬ হিঃ ৩০শে শাওয়াল, ই. ১৮২১ এর জুলাই মাসে প্রায় চারশো নারী পুরুষের এক বিরাট কাফেলা তাঁর সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করলো। এলাহাবাদ পৌছতে পৌছতে কাফেলা সাতশোতে দাঁড়ালো। দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো। তিনি মানুষকে সত্যিকার মুসলমানী জীবন যাপনের আহবান জানালেন এবং হজ্বের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেন।

হজ্বকাফেলা নৌকা যোগে এলাহাবাদ থেকে বেনারস, মীর্জাপুর, চুনারগড়, গাজীপুর, দানাপুর, ফুলওয়ারী শরীফ, প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে আযীমাবাদ পৌছে।

আযীমাবাদ অবস্থানকালে তিব্বতের একটি দল তাঁর সাথে দেখা করে। তিনি তাদেরকে তিব্বতে ইসলামী দাওয়াতের কাজ সুপর্দ করেন এবং বলেন যে, অসীম ধৈর্য সহকারে এ কাজ করে যেতে হবে। এভাবে তিব্বতেও সাইয়েদ সাহেবের দ্বীনের দাওয়াত প্রচার হতে থাকে।

আযীমাবাদ থেকে হজ্বকাফেলা হুগলী পৌছলে কোলকাতা নিবাসী জনৈক মুন্সী আমীনুদ্দীন গোটা কাফেলাকে তাঁর মেহমান হিসাবে কোলকাতায় নিয়ে আসেন। এখানে চারদিক থেকে খোদাপ্রেমে পাগল হাজার হাজার নারী পুরুষ তাঁর মুরীদ হন। বহুলোক হজ্বের জন্যে বহু হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করেন। সাইয়েদ সাহেবও তাঁর সুললিত ও অমিয় ভাষণে তাঁদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করেন। গোলাম রসুল মেহের তাঁর গ্রন্থে হজ্ব সফরের আগাগোড়া বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু কোলকাতা থেকে জাহাজ যোগে মক্কা রওয়ানার তারিখ লিপিবদ্ধ করেন নি।

সাইয়েদ সাহেবের কাফেলায় মোট সাত শ' তিপ্পান্ন জন হজ্বযাত্রী ছিলো। দশটি জাহাজে তাঁদেরকে বিভক্ত করে দেয়া হয়। সাইয়েদ সাহেব 'দরিয়া বাকা' নামক একটি পুরাতন জাহাজে দেড়শ' যাত্রীসহ যাত্রা করেন। ভালো ভালো জাহাজগুলি অন্যান্যদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন।

রায় বেরেলী থেকে রওয়ানা হওয়ার দশ মাস পর ১২৩৭ হিঃ ২৮ শে শা'বান, ইং ১৮২২ সালের ২১শে মে কাফেলাসহ সাইয়েদ সাহেব পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন।

হজ্বের পর সাইয়েদ সাহেব কয়েক মাস মক্কায় অবস্থান করেন। গোটা রমযান মাস হারাম শরীফে কাটান। অতঃপর যিলকদ মাসের প্রারম্ভে গৃহের উদ্দেশ্যে জিদ্দা পরিত্যাগ করে ২০শে যিলহজ্ব বোম্বাই পৌছেন। বোম্বাই থেকে কোলকাতা এবং অতঃপর ইং ১৮২৪ সালের ২৯ শে এপ্রিল আপন জন্মস্থান রায়বেরেলী পৌছেন।

হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যেখানেই তিনি যান, অসংখ্য লোক তাঁকে এক নজর দেখার জন্যে এবং তাঁর পবিত্র হস্তে বয়আত করার জন্যে ভীড় করতে থাকে। হাজার হাজার লোক তাঁর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর দলভুক্ত হয়ে যায়।

রায় বেরেলী পৌছার পর সাইয়েদ সাহেব সর্বাত্মক সংগ্রাম বা জেহাদের প্রস্তুতি করতে থাকেন। মুসলমানদেরকে অনৈসলামী কুসংস্কারমুক্ত করে খাঁটি তৌহীদপন্থী বানাবার জন্যে সংস্কার সংশোধনের কাজ শুরু করেন শাহ ইসমাইল। তাঁর প্রণীত "তাক্‌বিয়াতুল ঈমান" এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ। অবশ্য পীরপূজা ও কবরপূজাকে ভিত্তি করে যারা তাদের ব্যবসা জমজমাট করে রেখেছিল, তাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও করা হয়েছিল।

সাইয়েদ সাহেবের যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়েছিল তখন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, এ দেশের বিরাট মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে গেছে। তার ধ্বংসস্তূপের উপর যে দু'চারটি মুসলমান রাষ্ট্র মাথা তুলেছিল, তাও শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ গোটা ভারতের উপরে তার আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও একটি বিরাট অঞ্চলে শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানরা শুধু রাজ্য হারায় নাই, আপন দ্বীন ও 'সেরাতে মুস্তাকীম' থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে। তাদের আকীদাহ বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও আচার অনুষ্ঠান অনৈসলামী চিন্তাধারা ও ধর্মকর্মের দ্বারা প্রভাবিত। মুসলমান আমীর-ওমরা যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা ভোগবিলাসে লিপ্ত এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য এ ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না যে— যেমন করেই হোক তাদের জীবনের সুখ সম্ভোগের উপায় উপাদানগুলি যেন অক্ষুণ্ন থাকে। তার জাতীয় পরিণাম যা কিছুই হোক না কেন, এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ তাদের ছিল না। জনগণের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই ছিল যেন তাদের উপরে বজ্রপাত হয়েছে এবং তারা জ্ঞান ও সম্বিতহারা হয়ে পড়েছে, অথবা প্রবল ভূকম্পন শুরু হয়েছে এবং তারা হয়ে পড়েছে দিশাহারা।

যাদের কিছু জ্ঞান বুদ্ধি ছিল, তারা কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না। অন্ধকার ভবিষ্যতকে তারা ভাগ্যের লিখন মনে করে চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে বসে ছিল এটা মনে করে যে, যা হবার তা হবেই। কিন্তু তরী যখন নদীবক্ষে ঘূর্ণাবর্তে পতিত হবে, তার পাল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, নংগর কোন কাজে আসবে না, এবং কর্ণধারেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না তখন আরোহীদের জীবন রক্ষার কোন্ আশা আর বলবৎ থাকবে? মুসলমানরা তখন এমনি এক নৈরাশ্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এমনি এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সাইয়েদ সাহেব তাঁর জ্ঞানচক্ষু খোলেন। তিনি দেখলেন তাঁর সম্মুখে মাত্র তিনটি পথই উন্মুক্ত রয়েছে।

এক– হককে পরিত্যাগ করে বাতিলের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধ স্থাপন করা।

দুই– হককে পরিত্যাগ না করা। বরঞ্চ হকের সংগে জড়িত থাকতে গিয়ে যেসব বিপদ আপদ ও দুঃখ দারিদ্র্য আসবে, তা নীরবে সহ্য করা।

তিন– পুরুষোচিত সাহস ও শৌর্যবীর্য সহকারে বাতিলের মুকাবিলা করতঃ এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করা— যাতে করে হকের জন্যে বিজয় সাফল্য সূচিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

প্রথমটি হলো মৃত্যুর পথ, জীবনের পথ নয়। দ্বিতীয়টির পরিণাম ফল এই হতে পারে যে ক্রমশঃ ধুঁকে ধুঁকে এবং যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার ভিতর দিয়ে জাতির জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। তৃতীয় পথটিই হলো জাতীয় আত্মমর্যাদার পথ, বীরত্ব ও সৎ সাহসের পথ। নবজীবন লাভ করে আত্মমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ। সাইয়েদ সাহেব এই তৃতীয় পথটিই অবলম্বন করেছিলেন। এ পথে চলার সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

মক্কা শরীফ থেকে রায় বেরেলী প্রত্যাবর্তনের পর থেকে কয়েক বৎসর তিনি জেহাদের প্রস্তুতি ও প্রচারণা চালান। তিনি দেশের ধর্মীয় নেতাদের নিকট পত্র পাঠালেন ফরয হিসাবে জেহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে। তিনি স্বয়ং এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমাজ সংস্কার ও সংগঠন করতে হলে শক্তি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। তিনি কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমানের নিকটে সর্বতোভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করার ও সাহায্য করার আবেদন জানান। একখানি পত্রে তিনি নবাব সুলেমানজাকে লিখেছিলেন ঃ

আমাদের বরাতের ফেরে হিন্দুস্থান কিছুকাল খৃষ্টান ও হিন্দুদের শাসনে এসেছে এবং তারা মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে জুলুম শুরু করে দিয়েছে। কুফরী ও বেদাতীতে দেশ ছেয়ে গেছে এবং ইসলামী চালচলন প্রায় উঠে গেছে। এসব দেখে শুনে আমার মন ব্যথায় ভরে গেছে। আমি হিজরত করতে অথবা জেহাদ করতে মনস্থির করেছি।

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ১৫৭)

সাইয়েদ আহমদ জেহাদ বলতে বুঝিয়েছেন ঃ

"যদি কোন মুসলমান অধ্যুষিত দেশ অমুসলমানদের অধীনে আসে, তাহলে সে দেশের প্রতিটি মুসলমান নর–নারীর উপরে জেহাদ ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের উপরে জেহাদ হয়ে পড়ে ফরযে কেফায়া।"

শাহ ইসমাইলকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"জেহাদের উদ্দেশ্য ধন–সম্পদ অর্জন বা খ্যাতিলাভ করা নয়। বিভিন্ন অংশ জয় করা বা স্বীয় স্বার্থ পরিতৃপ্ত করা অথবা নিজের জন্যে একটা রাজ্য স্থাপন করাও জেহাদের উদ্দেশ্য নয়। জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তা বিনষ্ট করা।"

—(স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর, পৃঃ ৮৩)

সাইয়েদ সাহেব আল্লাহর পথে জেহাদকে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে এবং পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করেন। শুধু নিজের জন্যেই নয় জেহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তিনি দেশে ও বিদেশে বহু মুসলিম শাসক ও আমীর ওমরাহ্‌র কাছে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষায় বহু পত্র লিখেন। তাঁর বহু পত্রের মধ্যে কতিপয় পত্রের উল্লেখ করেছেন গোলাম রসুল মেহের তাঁর গ্রন্থে। সাইয়েদ সাহেব নিম্নলিখিত শাসকদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন ঃ

১। আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খান বারাকজাই– কাবুল।
২। ইয়ার মুহাম্মদ খান– পেশাওর।
৩। সুলতান মুহাম্মদ– কোহাট ও বান্নু।
৪। সাইয়েদ মুহাম্মদ খান– হাশ্ত্‌নগর।
৫। শাহ্ মাহমুদ দুররানী– হিরাট।
৬। জামান শাহ্ দুররানী

৭। নসরুল্লাহ– বোখারা।

৮। সুলায়মান শাহ– চিত্রাল।

৯। আহমদ আলী– রামপুর।

১০। মুহম্মদ বাহাওয়াল খান আব্বাসী নসরৎ জং– বাহাওয়ালপুর।

উপরন্তু ভারতের অত্যন্ত প্রভাবশালী ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন আমীর ওমরাহ্‌র নিকটেও তিনি জেহাদে যোগদানের জন্যে এবং সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে পত্র দ্বারা আহবান জানান। তাঁদের মধ্যে গোয়ালিয়রের জনৈক হিন্দু রাজা হিন্দু রাওয়ের নিকটেও তিনি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের মর্ম নিম্নরূপ ঃ

"বিদেশী ব্যবসায়ীরা এ দেশের শাসক হয়ে বসেছে। তারা আমাদেরকে সকল দিক দিয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের কর্ণধার যারা তারা এখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এমনি অবস্থায় নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরে বাধ্য হয়ে কতিপয় নিঃস্ব ও দরিদ্র লোক আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাঁর দ্বীনের খেদমতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এরা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও পদ মর্যাদার প্রত্যাশী নয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো যে, জয়লাভ করলে এ দেশের শাসনভার এ দেশেরই লোকদের হাতে তুলে দেয়া হবে।"

আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতিকল্পে সাইয়েদ সাহেব একটা সংগঠন কায়েম করেন এবং ভারতের প্রধান প্রধান শহরে তাঁর বিশ্বস্ত খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী রামপুরীকে তিনজন সহকর্মীসহ হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) পাঠানো হয়।

২। সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী অতঃপর মাদ্রাজ গমন করলে মওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদীকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়।

৩। মওলানা এনায়েত আলী আযীমাবাদীকে পাঠানো হয় বাংলায়।

৪। মওলানা সাইয়েদ আওলাদ হাসান কনৌজী এবং সাইয়েদ হাফীযুদ্দীনকে ইউপিতে দায়িত্ব দেয়া হয়।

৫। মিয়া দীন মুহাম্মদ, মিয়া পীর মুহাম্মদ এবং আরও অনেকের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে জেহাদের আহবান পৌছাবেন এবং অর্থ সংগ্রহ করবেন।

জিহাদ কার্য পরিচালনার জন্যে পাটনাকে প্রধান কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। ১৮২২ সালে সাইয়েদ আহমদ যখন পাটনা গমন করেন, তখন বেলায়েত আলী ও মুহাম্মদ হোসেন তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পাটনাকে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল স্থাপন করতঃ সাইয়েদ সাহেব চারজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তাঁরা হলেন, মওলানা বেলায়েত আলী, মুহাম্মদ হোসেন, এনায়েত আলী এবং ফরহাদ হোসেন।

ভারতের সর্বত্র জেহাদের প্রচারণা ও প্রস্তুতি শেষ করে সাইয়েদ আহমদ ১৮২৬ সালে তাঁর জন্মভূমি রায়বেরেলী ত্যাগ করেন। তারপর আর সেখানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হয়নি। জীবনের বাকী বছর তিনি ক্রমাগত আল্লাহ্‌র পথে জেহাদে অতিবাহিত করে শাহাদতের অমৃত পানে জীবনকে ধন্য করেন।

যহোক, যাত্রার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ, যুদ্ধের হাতিয়ার, সরঞ্জাম, ঘোড়া, রসদ প্রভৃতি আনা শুরু হলো। আল্লাহর পথে জান কুরবান করার জন্যে হাজার হাজার মুজাহিদ তার ঝান্ডার নীচে জমায়েত হতে লাগলো। এভাবে যাত্রাকালে তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো বারো হাজার। সাইয়েদ সাহেবের ভক্ত-অনুরক্ত টংকের নবাব মুজাহিদ বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানান এবং জেহাদের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম নিজ তত্ত্বাবধানে সরবরাহ করে দিয়ে বিদায় করেন।

অতঃপর মুজাহিদ বাহিনী টংক থেকে সিন্ধু, হায়দরাবাদ, শিকারপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে বোলান পাসের ভিতর দিয়ে আফগানিস্তানের কান্দাহারে প্রবেশ করে।

ইতিপূর্বে মুজাহিদ বাহিনী সিন্ধুর খয়েরপুর পৌঁছলে খয়েরপুরের মীর রুস্তম আলী সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ হন এবং টংকের নবাবের মতো তাঁকে মোটা রকমের অর্থ সাহায্য করেন। আফগানিস্তান পৌছে সাইয়েদ সাহেব আফগান আমীরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমীর তাঁকে কোনরূপ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। যাহোক তথা হতে মুজাহিদ বাহিনী সীমান্তের নওশেরায় উপনীত হয়। এ সুদীর্ঘ পথে মুজাহিদ বাহিনীকে চরম অসুবিধা ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। তবে তাদের যাত্রাপথে চারদিক থেকে সরদারগণ, শাসকগণ স্থানীয় কর্মচারীগণ ও জনসাধারণ সাইয়েদ সাহেবকে আনুগত্য জানিয়েছিল। কেউ বা বিবিধ উপঢৌকনাদি দিয়ে, কেউ তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ

করে এবং কেউ বা তাঁর বাহিনীতে যোগদান করে। তাঁর বাহিনীতে যোগদান করেছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক— এমনকি সুদূর বাংলাদেশের বহু সংখ্যক মুজাহিদ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রামের সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী যিনি বালাকোটের বিপর্যয়ের পর গাজী হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন আপন জন্মভূমিতে। তাঁর মুরীদ ও খলিফা ছিলেন সূফী ফতেহ আলী সাহেব যিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন কোলকাতার মানিকতলায়। বহু সংখ্যক বাংলাদেশী শাহাদত বরণ করেছেন এবং অনেকেই বালাকোট, সোয়াত প্রভৃতি স্থানে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেন। তাঁদের বংশধর এখনো বিদ্যমান আছে। বালাকোটে তাঁদের জনৈক বংশধরের সাথে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৬৩ সালে।

সাইয়েদ সাহেব রায় বেরেলী থেকে দিল্লী গমন করে যখন শাহ আবদুল আযীযের নিকটে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করছিলেন তখনই তিনি জানতে পারেন পাঞ্জাবে শিখ রাজ্যের অধীনে মুসলমানদের চরম নির্যাতনের কথা। মজলুম মুসলমানদের সহানুভূতিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠে এবং তখনই তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন তার প্রতিকারের। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্তে তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেন এবং সেখান থেকে অভিযান চালাবেন অন্যত্র মুসলিম দুশ্‌মন শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে। এ কারণেই তিনি সীমান্তকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসাবে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, সীমান্তের যেসব মুসলমানের সাহায্য সহযোগিতার আশা হৃদয়ে পোষণ করে সাইয়েদ সাহেব তাঁর জেহাদের রূপরেখা রচনা করেছিলেন, তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। নওশেরায় পৌছার পর থেকে বালাকোটের যুদ্ধ পর্যন্ত ছোটো বড়ো এগারটি বা ততোধিক যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী শত্রুর মুকাবিলা করে । এ সবের বিস্তারিত বিবরণের জন্যে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন। তার অবকাশ এখানে নেই।

নওশেরায় পৌছার পর সাইয়েদ সাহেব ইসলামের রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী শিখদেরকে প্রকাশ্যে আহবান জানান ইসলাম গ্রহণ করতে, অথবা বশ্যতা স্বীকার করতে অথবা অস্ত্রের মুকাবিলা করতে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই হলো এবং এক নৈশ যুদ্ধে মাত্র নয়শত মুজাহিদ বৃহৎ শিখবাহিনীকে পরাজিত করে। তাদের বিজয় লাভে সীমান্তবাসী তাঁদের প্রশংসায় মুখর হয়ে দলে দলে মুজাহিদ

বাহিনীতে যোগদান করলো। বহু স্থানীয় সরদার বিশেষ করে ইউসুফ জায়ীরা সাইয়েদ সাহেবের দলে যোগ দিলো।

কিছুকাল পর মনপুরী ও পঞ্জতরেও শিখরা পরাজয় বরণ করলো। মুজাহিদদের এ সাফল্যের ফলে গরহি ইমাজির দশহাজার যোদ্ধা সাইয়েদ সাহেবকে ইমাম হিসাবে স্বীকার করে নিল। পেশাওরবাসীগণ নওশেরায় ঘাঁটি করে শিখদের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে অভিযান শুরু করার জন্যে সাইয়েদ সাহেবকে অনুরোধ জানায়। এ সময় প্রায় লক্ষাধিক লোক মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করে।

কিন্তু সীমান্তের সরদারগণ ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর ও অর্থগৃধ্নু। শিখ সেনাপতি বুধ সিংহ অর্থের প্রলোভনে পেশাওরের সরদারকে হাত করে ফেলে। তারা এতটা নীচতায় নেমে যায় যে অর্থের জন্যে তারা সাইয়েদ সাহেবকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করে। কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরতে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। এ সময়ে শিখদের সাথে যে যুদ্ধ হয়, তাতে সরদারগণ শিখদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত হয়।

সীমান্তের পাঠান সরদারদের ডিগ্‌বাজি ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুন মুজাহিদ বাহিনীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। টংকের নবাবের নিকটে সাইয়েদ সাহেবের লিখিত এক পত্রে জানা যায় যে, প্রায় তিন লক্ষ লোক বয়আত গ্রহণ করে তাঁর দলে যোগদান করে। কিন্তু এর প্রায় সকলেই ছিল স্থানীয় লোক। সম্ভবতঃ যুদ্ধের মালে গনিমত লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই তারা সাইয়েদ সাহেবের দলে যোগদান করে। তাদের ইসলামী চরিত্র বলে কিছু ছিল না। সাইয়েদ সাহেব তাঁর অতি সরলতার জন্যে তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহকর্মী ছিলেন তাঁরাই যাঁরা বাইর থেকে গিয়েছিলেন। তাঁরা বিপদে আপদে সাইয়েদ সাহেবের সংগে ছায়ার মতো থাকতেন এবং প্রয়োজনে অকাতরে জান দিয়েছেন। এঁদের সংখ্যা ছিল হাজার খানেকের মতো। তাঁদের মধ্যে যারা যুদ্ধে শাহাদত বরণ করতেন তাদের স্থান অধিকার করতেন নবাগতের দল। দূর দূর অঞ্চল হতে কাফেলা আসতো জেহাদে যোগদানেচ্ছু মানুষ নিয়ে, টাকাকড়ি, রসদ ও চিঠিপত্র নিয়ে। তাঁদেরকে রসদ যোগান হতো সারা ভারতব্যাপী "তারগিবে মুহাম্মদীয়া" প্রতিষ্ঠানের গোপন কর্মকুশলতায়। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধুলো দিয়ে টাকাকড়ি আসতো বিহার ও বাংলা থেকে। তার সংগে আসতো

খোদার পথে উৎসর্গীকৃত মুজাহিদের দল।

যুদ্ধের রসদ, খাদ্য দ্রব্যাদি, টাকাকড়ি প্রভৃতি যা আসতো তা বায়তুলমালে জমা করা হতো যার রক্ষক ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর ভাইপো মুজাহিদ বাহিনীর কুতুব মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ। অতীব ন্যায়নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সুশৃংখলতার সাথে রসদ ও টাকাকড়ি বন্টন করা হতো মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে। স্বয়ং সাইয়েদ সাহেবও একজন সাধারণ মুজাহিদের চেয়ে অধিক পরিমাণে কিছু পেতেন না।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত এসব আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের মুকাবিলা করতে হতো ত্রিপক্ষের। শিখ, বিশ্বাসঘাতক পাঠান সরদার এবং হুন্দের দুর্গমালিক খাদে খাঁ— এ ত্রিশক্তি ছিল মুজাহিদ বাহিনীর দুশমন। এক সাথে এই তিন শক্তির মুকাবিলা তাঁদেরকে করতে হয়েছিল।

শিখদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকতো। বাংলা, বিহার ও মধ্য প্রদেশের মুজাহিদগণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতেন। শিখ ও বিশ্বাসঘাতক পাঠানরা তাঁদের হাতে মার খেতো। পেশাওরের দুররানী সরদারগণও প্রকাশ্যে শিখদের সাথে যোগদান করলো এবং খাদে খাঁ স্থানীয় পাঠানদেরকে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে সব সময়ে ক্ষিপ্ত করে তুলতো।

এবার সাইয়েদ সাহেব খাদে খাঁকে শায়েস্তা করার জন্যে শাহ্ ইসমাইলকে মাত্র দেড়শত মুজাহিদসহ হুন্দ দুর্গ অধিকারের জন্যে পাঠান। রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ তাঁরা হুন্দ আক্রমণ করে তা দখল করেন এবং খাদে খাঁ নিহত হয়। খাদে খাঁর ভাই ইয়ার মুহাম্মদের সংগে মিলিত হয়ে বিরাট বাহিনীসহ হুন্দ দুর্গ পুনরুদ্ধারের জন্যে অগ্রসর হয়। ফলে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় এবং ইয়ার মুহাম্মদ নিহত হয়। শত্রুপক্ষের বহু কামান হস্তগত করা হয় এবং প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম ও মালামাল মুজাহিদ বাহিনীর হস্তগত হয়। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাগণ তার অধিকাংশই লুন্ঠন করে নিয়ে যায়। মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান বিশ্বাসঘাতক দুশমন খাদে খাঁ, ইয়ার মুহাম্মদ খাঁ ও আমীর খানের মৃত্যুর পর এখন শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো শিখ ও পেশাওরের সুলতান মুহাম্মদ খান। হুন্দের যুদ্ধের পর সাইয়েদ সাহেব পেশাওরে ঘাঁটি স্থাপন করার মনস্থ করলে আম্বের পায়েন্দা খান বাধা দেয়। এখানেও শিখ ও পাঠানদের মিলিত শক্তির মুকাবিলা মুজাহিদ বাহিনীকে করতে হয়। এখানেও তারা পরাজিত হয় এবং আম্ব থেকে মর্দান পর্যন্ত মুজাহিদ

বাহিনীর অধিকার স্বীকৃত হয়। এখন পেশাওর পর্যন্ত অগ্রসর হতে তাঁদের আর কোন প্রতিবন্ধকতা রইলোনা।

সুচতুর সুলতান মুহাম্মদ অবস্থা বেগতিক দেখে সাইয়েদ সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করার অংগীকার করলে সাইয়েদ সাহেব তাকে ক্ষমা করেন এবং শাসন পরিচালনার দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হয়। মওলানা জাফর থানেশ্বরী তাঁর 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ' গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে সাইয়েদ সাহেব তাঁর সরলতার দরুন নিঃস্বার্থভাবে সুলতান মুহাম্মদকে দায়িত্বভার দিয়ে ভুল করেছিলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কিন্তু সাইয়েদ সাহেবের কাজের প্রতিবাদ করার সাহস কারো হয়নি। শরিয়তের আইনে বিচারের জন্যে মওলানা শাহ মযহার আলীকে কাযী নিযুক্ত করা হয়।

সাইয়েদ সাহেব এবং তাঁর হাতে গড়া মুজাহিদগণের পদমর্যাদা লাভের কোন বাসনা ছিল না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ জীবনে খোদার আইন জারী করাই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। সুলতান মুহাম্মদের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করার পেছনে সাইয়েদ সাহেবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল যার জন্যে বহিরাগত মুজাহিদগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্থানীয় লোকের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শরিয়তের বিধান জারী করা, স্বয়ং ক্ষমতা উপভোগ করা নয়।

যাহোক, আপাতঃদৃষ্টিতে এক বিরাট অঞ্চলের উপর ইসলামী হুকমুত কায়েম হলো। সাইয়েদ সাহেব ইসলামী সমাজ ও ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তনে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। পেশাওর তথা সমগ্র সীমান্ত এলাকা জুড়ে প্রচারকদল নিয়োজিত হলো। তাঁরা গ্রামে গ্রামে ইসলামী জীবন বিধান ও শরিয়তের আইন কানুনের প্রচারে লিপ্ত হলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থানীয় অধিবাসীগণ ছিল দরিদ্র, অজ্ঞ, অর্থলোভী ও বহুদিনের জাহেলী কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। প্রচারকগণ যখন তাদের এসব কুসংস্কার পরিহার করে ইসলামী জীবন যাপনের আহবান জানাতে লাগলেন, তখন তাদের পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক, গোত্রীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থে চরম আঘাত লাগে। ফলে তারা শুরু করলো অসহযোগ। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সঞ্জাত ক্ষমতা ও অর্থলোভী মোল্লার দলও করলো তীব্র বিরোধিতা। তার ফলে স্থানীয়

অধিবাসীগণ সাইয়েদ সাহেবের বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশে ফেটে পড়লো। বিশ্বাসঘাতক সুলতান মুহাম্মদও তাই চাইছিল এবং সে এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। অতি গোপনে সমগ্র অঞ্চলে এক গভীর ষড়যন্ত্রজাল ছড়ানো হলো এবং একই দিনে একই সময়ে ফজরের নামাযের সময় নামাযে রত মুজাহিদ প্রচারকদলকে নির্মমভাবে নির্মূল করা হলো। একজন অলৌকিকভাবে আত্মরক্ষা করেন এবং পলায়নকরতঃ সাইয়েদ সাহেবের নিকটে ঘটনা বিবৃত করেন।

সাইয়েদ সাহেব অত্যন্ত মর্মাহত হন। একই আঘাতে তাঁর কয়েকশত আল্লাহ্র পথে উৎসর্গীকৃত কর্মী জীবন হারালেন। একটা আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠনের আশাও তাঁর বিলীন হয়ে গেল। তিনি বিশ্বাসঘাতক ও নিমকহারামদের দেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মনস্থ করলেন।

জাফর থানেশ্বরী বলেন, সাইয়েদ সাহেব অতঃপর তাঁর কর্মীগণকে একত্র করে বলেন, "আমার আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। পাঠানরা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ইসলামী সমাজ গঠনের কোন আশা আর এখানে নেই। এখন আমার জন্যে হিজরত করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। আমি বালাকোট গিলগিট পথে অন্য দেশে চলে যাব। আল্লাহ্ তৌফিক দিলে আবার এ কাজে হাত দিব। আমি যে পথে অগ্রসর হতে চাই সে পথ বড়োই দুর্গম, পদে পদে বিপদের আশংকা রয়েছে। এ পথে চলার জন্যে তোমাদেরকে আহবান জানাব না। তোমরা ইচ্ছা করলে যে যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারো।"

তখন সকলেই এক বাক্যেই বলেছিলেন, 'জেহাদে পা বাড়িয়ে পশ্চাদপদ হওয়া ঈমানের খেলাপ। আমরা সর্বাবস্থায় হুজুরের অবিচ্ছেদ্য সংগী হয়ে থাকতে চাই।'

অতঃপর সাইয়েদ সাহেব তাঁর অবশিষ্ট মুজাহিদগণ সহ বালাকোটের দিকে যাত্রা করেন। এ সময়ে শের সিংহের সৈন্য বাহিনী মুজাহিদগণের মুখোমুখী ছিল।

সাইয়েদ সাহেব বালাকোট থেকে নওয়াব উযীরউদ্দৌলাকে যে পত্র লিখেন তার মর্ম নিম্নরূপ—

"পেশাওরের লোকেরা এমনই হতভাগ্য যে, তারা জেহাদে আমাদের মুজাহিদ বাহিনীর সংগে যোগ দিল না। উপরন্তু তারা প্রলোভনে পড়ে গেল এবং সারা দেশময় নানা কাজে আমাদের যেসব মহৎ লোক ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের অনেককেই হত্যা করে ফেল্লো।. . . সেখানে আমাদের অবস্থানের আসল উদ্দেশ্য

ছিল যে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদে বহু সংখ্যক স্থানীয় মুসলিমের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যাবে। বর্তমানে যখন আর কোনও আশা নাই, তখন আমরা স্থির করলাম যে, সেখান থেকে পাখলীর পাহাড়ী অঞ্চলেই স্থান বদল করব। . . . এখন আমাদের ঘাঁটি এমন নিরাপদ স্থানে অবস্থিত যে, আল্লাহর মরযী দুশমনরা আমাদের সন্ধানও পাবে না।. . . ইসলামের তরক্কীর জন্যে ও মুজাহিদ বাহিনীর সাফল্যের জন্যে আল্লাহ্র দরবারে দিনরাত মুনাজাত করতে থাকুন।"

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ১৬৪)

সাইয়েদ সাহেব তাঁর মুজাহিদ বাহিনীসহ বলাকোটের সৌন্দর্য মন্ডিত উপত্যকা বিশ্রামের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন। পূর্ব দিক দিয়ে কুন্হার বা কাগান পাহাড়ী নদী অবিরাম কুল কুল তানে বয়ে চলেছে। উত্তর পশ্চিম দিক থেকে সংকীর্ণ পাহাড়ী ঝর্ণা বার্না বড়ো বড়ো উপল খন্ডের ভেতর লুকোচুরি খেলতে খেলতে উদ্দাম উচ্ছল গতিতে বালাকোটে কুন্হার নদীগর্ভে প্রবেশ করেছে। বার্না ঝর্ণার উত্তর দিকে প্রশান্ত নূরী ময়দান। প্রকৃতির এ লীলা ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে মনে হয় কে যেন জীবন নদীর পরপার থেকে হাতছানি দিচ্ছে। রণক্লান্ত মুজাহিদগণ বিশ্রামের জন্যে এখানে ছাউনী পাতলেও পরপারের হাতছানি হয়তো তাঁদের দৃষ্টির অগোচর হয়নি। তাই বিশ্রাম তাঁদের ভাগ্যে ঘটেনি।

ওদিকে শিখরা মুজাহিদ বাহিনীর সন্ধানে ছিল। তারা মনে করেছিল সাইয়েদ সাহেবের লক্ষাধিক মুজাহিদের কয়েক শ' মাত্র টিকে রয়েছে এবং তারা হয়ে পড়েছে হতোদ্যম। এ সুযোগেই তাদের আঘাত হানতে হবে।

সে সময়ে বালাকোটে যাওয়ার দুটি মাত্র পথ ছিল। একটি ছিল এমন পাহাড়ী বনজংগলে পরিপূর্ণ যে স্থানীয় লোক ব্যতীত সে পথে চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অপর পথটি ছিল একটি সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে ও একটি সেতুর উপর দিয়ে। এ দুইটি পথে অবশ্যি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক মোটা অর্থের লোভে অরণ্য সংকুল পথটিই শিখদের দেখিয়ে দেয়। ফলে তারা অতর্কিতে মুজাহিদ বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। মুজাহিদ বাহিনী সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকলেও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। সাইয়েদ আহমদ, শাহ ইসমাইল ও সাইয়েদ সাহেবের অন্যান্য প্রধান সহকর্মীগণ জেহাদ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন।

আবদুল মওদুদ বলেন, "তাঁর অনুসৃত বৃহৎ আন্দোলন স্তব্ধ হয় নাই। এই নিধন যজ্ঞের পরেও যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই টংকে অথবা বিহার শরীফের ছাতানায় সাইয়েদ সাহেবের বিশ্বস্ত খাদেমের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল স্থাপন করলেন। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা যখন শিখদের ন্যায় অত্যাচার শুরু করে, তখন মুজাহিদদের সর্বরোষ তাদের উপর উদ্যত হয়। কিন্তু তার দরুন তাদের ভাগ্যে জোটে কারাবাস, উৎপীড়ন ও ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণের নির্মম শাস্তি এবং তার চেয়েও হীনতম ছিল নিম্নশ্রেণীর মোল্লা ও তথাকথিত আলেমদের দ্বারা এসব সংগ্রামী অগ্রপথিকদের নামে অযথা কুৎসা রটনা ও মিথ্যা ভাষণ।"

তিনি আরও বলেন, "এখন সময় এসেছে এসব বীর মুজাহিদের গৌরবোজ্জ্বল অসমসাহসিক কার্যাবলীকে স্বীকৃতি দেয়া ও শ্রদ্ধা করা, কারণ তাঁরাই প্রকৃত পক্ষে এই উপমহাদেশে বহু পূর্বেই পাকিস্তানের বুনিয়াদ স্থাপনের মাধ্যমে সব রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন। যদিও সাইয়েদ সাহেবের প্রতিষ্ঠানের মারফৎ পাকিস্তান হাসিল হয় নাই, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, তার মধ্যেই ছিল বীজমন্ত্র; আর ওয়াকিফহাল ব্যক্তিমাত্রই হৃদয়ংগম করবেন যে রায় বেরেলীর সাইয়েদ আহমদ শহীদের দান ছিল এই চেতনা উজ্জীবনে অপরিসীম।"

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ১৬৫-১৬৬)

উপরে বলা হ'য়েছে যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদের জেহাদী আন্দোলনে বাংলাদেশ থেকে কয়েক সহস্র মুজাহিদ ও বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রেরিত হয়। রায় বেরেলী থেকে জেহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সময়ে বাংলাদেশের অনেকে সাইয়েদ সাহেবের সাথী হয়েছিলেন এবং জিহাদ চলাকালেও যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ সীমান্তে পৌছেছে তেমনি পৌছেছে হাজার হাজার মুজাহিদ।

গোলাম রসুল মেহের বলেন— বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথে মুজাহিদগণ দলে দলে সাইয়েদ সাহেবের সংগে মিলিত হন। এমনি একটি দলে ছিলেন মৌলভী ফতেহ্ আলী আযীমাবাদী। তিনি তাঁর দলের যে তালিকা পেশ করেন, অবশ্য যাদের নাম তাঁর স্মরণ ছিল, তাদের মধ্যে ছ'জন বাংলাদেশের ছিলেন। তাঁদের নাম ঃ

১। মৌলভী ইমামুদ্দীন
২। জহুরুল্লাহ্
৩। লুৎফুল্লাহ্
৪। তালেবুল্লাহ্
৫। ফয়েজউদ্দীন
৬। কাজী মদনী

(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৪১২ পরিশিষ্ট)

শিখ ও পাঠানদের সংগে মুজহিদগণের প্রায় এগার বারটি প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়েছে। এসব যুদ্ধে অবশ্যই মুজাহিদগণের অনেকেই শহীদও হয়েছেন। তাঁদের নাম এবং একদিন ফজরের নামাযে তাদের যে কয়েকশতকে শহীদ করা হয়েছে, তাঁদেরও নামধাম জানা যায়নি। তবে বালাকোটে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের একটি নামের তালিকা পেশ করেছেন— গোলাম রসুল মেহের। তাঁর প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী বালাকোটে সর্বমোট একশ পঁয়ত্রিশ জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশের। তাঁদের নাম হলো, আলীমুদ্দীন, ফয়েজউদ্দীন, লুৎফুল্লাহ্, শরফুদ্দীন, সাইয়েদ মুজাফফর হোসেন। উক্ত তালিকায় কাদের বখ্শ্, আবদুল কাদের, গাজীউদ্দীন ও বখ্শ্উল্লাহ— এ চারটি নাম স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাঁরা কোথাকার অধিবাসী তা দেয়া হয়নি। শুধু বখ্শ্উল্লাহর নামের শেষে বলা হয়েছে 'মেহের আলীর ভাই।' —(সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের, পৃঃ ৪৩২-৩৪)

সীমান্তে যখন সারা ভারত থেকে আগত মুজাহিদগণ জেহাদে লিপ্ত ছিলেন, ঠিক সে সময়েই সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর হিন্দু জমিদার, নীলকর ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত ছিলেন। তিতুমীর সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ ছিলেন। কিন্তু স্বদেশেই তিনি এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন যে, সাইয়েদ সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে শাহাদৎ বরণ করার সৌভাগ্য তার হয় নি। তবে যে পথে তাঁর মুর্শেদ খোদার সাথে মিলিত হন, সেই পথই অনুসরণ করেন শহীদ তিতুমীর। ১৮৩১ সালের ৬ই মে রোজ শুক্রবার প্রায় দুপুরের দিকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুজাহিদ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (রহ) শাহাদৎ বরণ করেন। ১৯৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ সৈন্যদের কামানের গোলায় শাহাদৎ বরণ করেন সাইয়েদ তিতুমীর।

বালাকোট বিপর্যয়ের কারণ

সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল, মওলানা আবদুল হাই প্রমুখ মনীষীগণ ভারতে ইসলামী আযাদীর তথা ইসলামী হুকুমত বা শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং যে আন্দোলন সাফল্যের দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হলো, তার কারণ অবশ্যই অনুসন্ধান করে দেখা আমাদের উচিত। কারণ অতীত ইতিহাসের চুলচেরা বিচার ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সঠিকভাবে নির্ণীত হতে পারে। চিন্তাশীল মনীষীগণ উপরোক্ত আন্দোলনের ব্যর্থতার যে কারণসমূহ বর্ণনা করেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। তবে সাময়িকভাবে এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী। সাইয়েদ আহমদ শহীদ যে খুনরাঙা পথে চলার দুর্বার প্রেরণা দিয়ে গেলেন ভারতীয় মুসলমানদেরকে; বাংগালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি,পাঠান নির্বিশেষে ভারতীয় মুসলমানগণ সে খুনরাঙা পথে অবিরাম চলেছে প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত। জেল-জুলুম, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, স্থাবর, অস্থাবর সম্পদের বাজেয়াপ্তকরণ, অমানুষিক ও পৈশাচিক দৈহিক নির্যাতন ক্ষণকালের জন্যেও তাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তথাপি এ আন্দোলনের নেতা স্বয়ং নিজের জীবদ্দশায় কেন এ সাফল্য দেখে যেতে পারেননি, তার কারণও আমাদের চিহ্নিত করা দরকার। প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১। ইসলামী আন্দোলন তথা আল্লাহর পথে জেহাদ পরিচালনার জন্যে যে কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন, তাদের প্রত্যেকের চরিত্র হতে হবে নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শে গড়া। তাদেরকে হতে হবে আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত। সাইয়েদ সাহেব বাইরে থেকে যে মুজাহিদ বাহিনী সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা উক্ত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এবং তাঁরাও অনুরূপ চরিত্রে চরিত্রবান ছিলেন, যাঁরা জেহাদ চলাকালে বাংলা, বিহার, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজন, আপন ঘরদোর, ক্ষেত-খামার ছেড়ে সাইয়েদ সাহেবের মুজাহিদ বাহিনীতে গিয়ে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা এক থেকে দু' হাজারের মধ্যেই ছিল সব সময়ে সীমিত। জেহাদের জন্যে সাইয়েদ সাহেবের জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে এবং প্রথমদিকে শিখদের উপরে অপ্রত্যাশিত বিজয়লাভ দেখে দলে দলে পাঠানরা সাইয়েদ সাহেবের দলে

যোগদান করে। কিন্তু তাদের সত্যিকার কোন ইসলামী চরিত্র ছিল না। তাদের মধ্যে ইসলামী প্রেরণা ও জোশ ছিল প্রচুর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র, অজ্ঞ, অর্থলোভী এবং বহুদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। যারা ছিল সরদার অথবা গোত্রীয় শাসক, তারাও ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী। কোন কোন সময়ে মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা তিন লক্ষ পর্যন্ত পৌছেছে। এরা প্রায় সবই বিভিন্ন পাঠান গোত্রের লোক। এরা অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, চরম মুহূর্তে প্রতিপক্ষ শিখ সৈন্যদের সংগে যোগদান করেছে। অথবা মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা কালীন শুধু গনিমতের মাল লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়ে বাহিনীর মধ্যে শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিকতা ভংগ করেছে। অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থ ও অর্থলোভের প্রবল প্লাবনে তাদের জলবুদবুদসম ইসলামী প্রেরণা ও জোশ ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

২। স্বয়ং সাইয়েদ সাহেব ও শাহ ইসমাইল দুর্ধর্ষ বীরযোদ্ধা ও রণকৌশলী থাকা সত্ত্বেও গোটা মুজাহিদ বাহিনীকে তৎকালীন যুদ্ধ বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।

৩। বিশ্বাসঘাতক ও চরিত্রহীন পাঠানদের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থা স্থাপন করাও ঠিক হয়নি। যে সুলতান মুহাম্মদ খাঁ এবং তার ভ্রাতৃবৃন্দ সাইয়েদ সাহেবের চরম বিরোধিতা করত, সেই সুলতান মুহাম্মদের উপরে পেশাওরের শাসনভার অর্পণ করাও ঠিক হয়নি। সুলতান মুহাম্মদই শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের উপর চরম আঘাত করে এবং একই রাতে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাইয়েদ সাহেবের কয়েকশ' বাছা বাছা মুজাহিদের প্রাণনাশ করে। যার ফলে সাইয়েদ সাহেবকে পেশাওর থেকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়।

৪। স্থানীয় পাঠানদের আল্লাহর পথে জীবন দানের চেয়ে জীবন বাঁচিয়ে পার্থিব স্বার্থলাভই উদ্দেশ্য ছিল। তাই যুদ্ধকালে তারা সত্যিকার মুজাহিদগণকে পুরোভাগে থাকতে বাধ্য করতো এবং নিজেরা যথাসম্ভব নিশ্চেষ্ট থাকতো এবং লুণ্ঠনের সুযোগ সন্ধান করতো।

৫। দেশের অধিকার লাভ করার পর শরিয়ত- আইন কার্যকর করার ব্যাপারেও হিকমতের পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে বহু দিনের নানাবিধ কুসংস্কার এমন শক্তভাবে দানা বেঁধে ছিল যে, শরিয়ত-আইন কার্যকর করতে গিয়ে তাদের সেসব কুসংস্কারে চরম আঘাত লাগে। যেসব অশিক্ষিত

মোল্লার দল এসব কুসংস্কার জিইয়ে রেখে তাদের জীবিকা অর্জন করছিল তারা হয়ে পড়েছিল ক্ষিপ্ত। সুবিধাবাদী সরদারগণও এর সুযোগ গ্রহণ করেছিল। অতএব জনসাধারণ, মোল্লার দল এবং সরদারগণ একযোগে বিরোধিতা শুরু করে মুজাহিদগণের। প্রথমে উচিত ছিল জনগণের চরিত্রের সংস্কার সংশোধনের কাজ শুরু করা এবং মনমস্তিষ্ক শরিয়তী আইন মেনে চলার উপযোগী হলে তা ক্রমশঃ কার্যকর করা। জনসাধারণ অবশ্য ছিল ইসলামেই দৃঢ় বিশ্বাসী এবং আযাদী সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা, কিন্তু তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রাকইসলামী "আইয়ামে জাহেলিয়াতের" চেয়ে কোন অংশেই উন্নত ছিল না।

স্থানীয় জনসাধারণ ও আদিবাসীদের মধ্যে এমন সব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল যা ছিল ইসলামী শরিয়তের সম্পূর্ণ খেলাপ। যেমন, যাকে খুশী তাকে বলপূর্বক বিয়ে করা, বিয়ের জন্যে কন্যা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা, বিধবাদেরকে মৃতের ওয়ারিশানের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়া, চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা, বিধবা বিবাহ না দেয়া, মৃতের নাজাতের জন্যে মোল্লাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়া প্রভৃতি। সাইয়েদ আহমদ যে শরিয়তী আইন জারী করেন তার মধ্যে ছিল— শরিয়ত বিরুদ্ধ সকল প্রকার আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও প্রথা একেবারে বাতিলযোগ্য। শরিয়তী আইনের মধ্যে আরও ছিল যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তির জন্যে শরিয়তী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে, উৎপন্ন ফসলের 'ওশর' বা দশমাংশ ও যাকাত আদায়ের পর তা বায়তুলমালে জমা হবে, এ বায়তুলমাল থেকে মুজাহিদ ও অন্যান্যের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে, আদিবাসী ও উপজাতীয়দের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তার চরম নিষ্পত্তির অধিকার থাকবে একমাত্র খলিফার, একটি পুলিশ বিভাগ স্থাপন করা হবে যার কাজ হবে জনগণের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা, প্রত্যেক মুসলমানকে সিয়াম (রোযা) ও সালাত (নামায) পালনে বাধ্য করা। এ ধরনের আরও অনেক গঠনমূলক ও কল্যাণমুখী আইন জারী করা হয়। নিঃসন্দেহে এ ছিল এক আদর্শিক পদ্ধতি যা নবী মুস্তাফা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতি অনুকরণেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আদিবাসী, উপজাতীয় পাঠান, জনসাধারণ ও মোল্লার দল এগুলোকে মেনে নেবে এমন মনমস্তিষ্ক তাদের গড়ে উঠেনি। অতএব শরিয়তী আইন পর্যায়ক্রমে কার্যকর না করে হঠাৎ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়াতে তারা তা মানতে অস্বীকার করে।

আদিবাসী পাঠানদের বিরোধিতার আর একটি প্রধান কারণ ছিল, শান্তি ও শৃংখলার জন্যে সকলকে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন করা হয়েছিল। কিন্তু আদিবাসী পাঠানদের মজ্জাগত প্রবৃত্তিই ছিল কারও হুকুমের অধীন না হওয়া। তাদের নিকটে আযাদী ছিল বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু কোনও সভ্য সরকার বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতে পারে না বলে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমত যখন আইন-শৃংখলার খাতিরে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলো তখন তারা ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পোষণ করলো।

আবদুল মওদূদ বলেন, "এ রকম পরিস্থিতিতে সহসা 'শরিয়তী আইন' প্রবর্তন কতদূর সমীচীন হয়েছিল, বিবেচনার যোগ্য। ইতিহাসের শিক্ষা ও দূরদর্শিতার মাপকাঠিতে বিচার করলে মনে হয়, এই পরিবর্তন সময়োপযোগী হয়নি। সহসা কোন জাতির জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় না। ক্রমে ক্রমে জাতীয় জীবনের ধারাকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করতে হয় লোকমানসের সাথে উপযোগী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করে। লোকমানসকে উপেক্ষা করে রাতারাতি তার পরিবর্তন করতে গেলে সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে জনমন তার প্রতি বিমুখই হয়ে উঠে, অন্তরের সংগে তা গ্রহণ করতে পারে না। লোকমানস ও পরিবেশকে অবহেলা করে দ্রুত জীবনধারার পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রেই বেদনাদায়কভাবে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।"

—(ওহাবী আন্দোলন, আব্দুল মওদূদ, পৃঃ ১৭৭)

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সর্বোৎকৃষ্ট জেহাদ— এ ছিল বিশ্বনবীর দৃপ্ত ঘোষণা। বাংলায় উৎপীড়নমূলক কোম্পানী শাসনে এবং হিন্দু জমিদার মহাজন, নীলকর ও তাদের দেশী বিদেশী দালালদের অত্যাচার উৎপীড়নে মুসলমান সমাজ যখন বিলুপ্তির পথে, তখন তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তারপর সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর সুযোগ্য খলিফা সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। অনুরূপভাবে বিদেশী ও বিধর্মী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে মুসলমানদের উপর শিখ শাসনের অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ব্যাপক কর্মসূচীর জেহাদ ঘোষণা করেন সাইয়েদ আহমদ। এ ছিল একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমানের দাবী। হিজরত, জিহাদ অথবা শাহাদত— এ তিনের যে কোন একটি গ্রহণেই একজন মুসলমান ঈমানের স্বাক্ষর বহন করেন। তাই মওলানা মুহাম্মদ আলী

জওহর বলেছিলেন— মুসলমানের জীবন কাহিনীর বিস্তৃতি মাত্র তিনটি অধ্যায়ে ঃ- হিজরত, জেহাদ ও শাহাদত। সাইয়েদ আহমদ ও শাহ ইসমাইলের জীবন এই তিনটি অধ্যায়ের মূর্ত প্রতীক।

বালাকোটের বিপর্যয়ের পর

বালাকোট প্রান্তরে মুজাহিদগণ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও এবং মুজাহিদ বাহিনীর পরিচালক সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও শাহ ইসমাইল অন্যান্যের সাথে শাহাদৎ বরণ করলেও যাঁরা গাজী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁদের কর্মতৎপরতা মোটেই হ্রাস পায়নি। এদের অনেকেই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জেহাদী আন্দোলন জাগ্রত রাখেন যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব তথা সারা ভারতব্যাপী আযাদী আন্দোলনে। এ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়নি ১৮৫৭ সালে, বরঞ্চ ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত ও বিপন্ন করে রেখেছিল। এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন— মওলানা বেলায়েত আলী, মওলানা মাহমুদুল্লা, মওলানা জাফর থানেশ্বরী, মওলানা ইয়াহিয়া আলী, মওলানা ইমামুদ্দীন, সুফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী প্রমুখ সাইয়েদ আহমদ শহীদের খলিফাগণ। তাঁদের সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা না করলে জেহাদী আন্দোলনের পূর্ণাংগ চিত্র পরিস্ফুট হবে না।

মওলানা বেলায়েত আলী

মওলানা বেলায়েত আলী ছিলেন পাটনার মওলভী ফতেহ্ আলীর পুত্র এবং তথাকার প্রসিদ্ধ আমীর রফিউদ্দিন হুসাইন খানের বংশধর। প্রচুর ঐশ্বর্যের কোলে লালিত পালিত হন বেলায়েত আলী। তাঁর কৈশোর ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয় আমীর ওমরাহদের গৌরবমন্ডিত শহর লক্ষ্ণৌ-এ। এ সময়ে যখন সাইয়েদ আহমদ জেহাদের দাওয়াত পেশ করতে লক্ষ্ণৌ আসেন, তখন বেলায়েত আলী তাঁর বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে জেহাদের ডাকে সাড়া দেন এবং রায়-বেরেলী গমন করেন। এখানে তিনি মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইলের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং বিলাসী জীবনের পরিবর্তে ফকিরী জীবন যাপন করতে শুরু করেন। তিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদের সাথে মিলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন এবং বনজংগল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে নিজ হাতে

রান্নার কাজ করতেন। আল্লাহ্‌র পথে এমন উৎসর্গীকৃত প্রাণকে সাইয়েদ সাহেব অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাইয়েদ সাহেবের নির্দেশে তিনি দু'মাস যাবত আফগানিস্তানে প্রচার কার্য চালান। জনৈক মওলানা মুহাম্মদ আলীসহ তিনি সোয়াত, হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্যে প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সাইয়েদ সাহেব বালাকোটে শাহাদৎবরণ করেন।

বালাকোটের বিপর্যয়ের পর মাওলানা বেলায়েত আলী ব্রিটিশ ভারতে প্রবেশ করে সাইয়েদ সাহেবের অসম্পূর্ণ কাজে হাত দেন। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্যে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর সহোদর ভাই মওলানা এনায়েত আলীকে পাঠান বাংলায়। মাওলানা যয়নুল আবেদীন ও মওলানা আব্বাস আলীকে তিনি যথাক্রমে উড়িষ্যা ও যুক্ত প্রদেশে মুবাল্লেগ নিযুক্ত করেন।

পাটনায় কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপন করতঃ মওলানা বেলায়েত আলী প্রচার কার্য শুরু করেন। দু'বৎসর পর তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। হজ্জের পর তিনি ইয়ামেন, নজদ, মাসকত, হাদারামওত প্রভৃতি স্থান সফর করেন। এ সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাজী মুহাম্মদ ইবনে আলী শওকানীর নিকটে হাদীস শাস্ত্রে সনদ লাভ করেন।

আরব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর ভ্রাতা এনায়েত আলীর নেতৃত্বে একটি মুজাহিদ বাহিনীকে গোলাব সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্যে সীমান্তে প্রেরণ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে গোলাব সিংহ ব্রিটিশের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে সীমান্তের মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং এনায়েত আলীর মুজাহিদ বাহিনী ছত্রভংগ হয়।

সীমান্ত অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর মওলানা বেলায়েত আলী লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। লাহোরের পুলিশ কমিশনার মওলানা ভ্রাতৃদ্বয়কে সকল প্রকার কর্মতৎপরতা থেকে বিরত থেকে দু'বৎসরের জন্যে একটি মুচ্‌লেকায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। অতঃপর তাঁরা পাটনায় প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন।

মুচ্‌লেকার দু'বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর মওলানা বেলায়েত আলী হিজরতের উদ্দেশ্যে কতিপয় সহকর্মীসহ পাটনা থেকে দিল্লী গমন করেন। এ সময়ে দিল্লী জামে মসজিদে এবং ফতেহ্‌পুর মস্‌জিদে ইসলামের দাওয়াত পেশ

করতে থাকেন। এ হচ্ছে ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের ঘটনা। এ সময়ে তিনি বাহাদুর শাহের আমন্ত্রণে লালকেল্লায় একবার তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন।

দিল্লীতে কিছুকাল অবস্থানের পর মওলানা বেলায়েত আলী লুধিয়ানা হয়ে পাঞ্জাব সীমান্তের সিত্তানায় গমন করেন। সিত্তানা ছিল মুজাহিদ বাহিনীর বড়ো কেন্দ্র। এখানে একটি খান্কাহ্ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খান্কাহ্ অর্থে মুজাহিদগণ বুঝতেন তাদের অভিযান কেন্দ্র। পাটনাকে বলা হতো ছোট খান্কাহ্ এবং সিত্তানাকে বড়ো খান্কাহ্। ছোটো খান্কাহ্ থেকে অর্থ, রসদ, মুজাহিদ বড়ো খান্কায় প্রেরিত হতো।

মওলানা বেলায়েত আলী সিত্তানায় পৌছে দেখেন যে তথাকার কর্মচাঞ্চল্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন।

এ সময়ে মওলানা বেলায়েত আলীর বিরুদ্ধে একটা ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলা আনয়ন করা হয়। মামলা চলাকালে তাঁর পাটনা সাদেকপুরস্থ দুটি বাসভবন ও বাগানবাড়ীসহ কয়েক লক্ষ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। গৃহের অধিবাসীগণকে এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীদিগকে নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় করে দেয়া হয়। ১৮৫৩ সালে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে হান্টার তাঁর দি ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থে বলেন ঃ "১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে স্যার হেনরী লরেন্স এক প্রতিবেদনে বলেন যে, উক্ত খলিফাদ্বয় (মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলী) পাঞ্জাবে মুজাহেদীন বলে সুপরিচিত ছিলেন এবং সেজন্যে তাঁদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশের হেফাজতে পাটনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের নিকট থেকে এবং তাঁদের স্বধর্মীয় দুজন উচ্চ বিত্তশালী লোকের নিকট থেকে ভবিষ্যতে সদাচরণের শর্তে মুচলেকা গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আমি তাঁদেরকে দেখেছি সমতল বংগের রাজশাহী জেলায় রাজদ্রোহ মূলক প্রচারকার্য চালাতে। একাধিকবার এ ধরনের প্রচারকার্যের জন্যে তাঁদেরকে দুই দুইবার রাজশাহী থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পাটনায় জামিন মুচ্‌লেকার দ্বারা এই দুই খলিফাকে তাদের আপন গৃহে যতোই আবদ্ধ রাখা হোক না কেন, ১৮৫১ সালেই তাঁদেরকে আবার দেখা গেছে পাঞ্জাবের সীমান্তে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনল উদ্‌গীরণ করতে।"

বিপ্লবী আহমদুল্লাহ

সাইয়েদ আহমদের জেহাদী আন্দোলনে বাংগালী অবাংগালী নির্বিশেষে যেমন সারা ভারতের মুসলমান সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল, তেমনি অংশগ্রহণ করেছিল সকল শ্রেণীর মুসলমান। চাষী, মজুর, দরজী, কশাই, মোল্লা, মওলভী, মওলানা এবং সরকারী দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী জীবনের সকল প্রকার ঝুঁকি নিয়ে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে অংশগ্রহণ করেন জেহাদী আন্দোলনে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আহমদুল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যতম।

আহমদুল্লাহ্‌র পিতার নাম ছিল এলাহী বখ্‌শ্। পাটনার অন্তর্গত ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাদিকপুরে এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেন আহমদুল্লাহ। আহমদুল্লাহ্ আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজী ভাষায়ও তাঁর প্রচুর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর পিতা এলাহী বখ্‌শ্ একজন প্রখ্যাত আলেম ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি শুধু একাই সাইয়েদ আহমদ শহীদের মুরীদ হননি, তাঁর তিন পুত্র ইয়াহিয়া আলী, ফয়েজ আলী ও আহ্‌মাদুল্লাহকেও সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ করেন। আহ্‌মদুল্লাহ প্রথম জীবনে ইংরেজ সরকারের শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পাটনায় জনশিক্ষা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। আহ্‌মদুল্লাহর পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল আহমদ বখ্‌ত্। সাইয়েদ সাহেব তা পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন আহমদুল্লাহ। তাঁর প্রথম নাম লোপ পায় এবং তিনি আহমদুল্লাহ নামেই পরিচিত হন।

সীমান্তে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে সাইয়েদ সাহেবের সৈন্যসংখ্যা ছিল দু'লক্ষেরও অধিক। এ বিরাট বাহিনীর জন্যে লোক ও অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল তৎকালীন ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ থেকেই বিশেষ করে বাংলা, বিহার উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ থেকে। এ কাজ চলতো একটা সুনিয়ন্ত্রিত গোপন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যা ১৮৫২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিশ-পঁচিশ বৎসর যাবত ইংরেজ সরকার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। এ গোপন প্রতিষ্ঠান ও তার সকল প্রকার কর্মতৎপরতার সাথে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী

আহমদুল্লাহ্ কতোখানি ওতোপ্রোত জড়িত ছিলেন তা জানা যায় একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে যা মিঃ র‍্যাভেন শ' (Raven Shaw) পেশ করেন ৯-৫-১৮৬৫ তারিখে বাংলা সরকারের নিকটে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে কর্তৃপক্ষ একটি ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি হস্তগত করে। হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধরা (মুজাহিদগণ) শৈলশিখর থেকে ভারতীয় চতুর্থ রেজিমেন্টের (Regiment of Native Infantry) সংগে যে একটা গোলযোগ পাকাতে চেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ এ থেকে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, এ ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হয় পাটনায়, এবং যে চিঠি ধরা পড়ে তাতে জানা যায় যে, সাদিকপুর পরিবারের বহু মৌলভী এবং অস্ত্রসজ্জিত বহু কাফেলা তখন সীমান্তের দিকে রওয়ানা হয়েছে। পেশাওরের একখানা স্বাক্ষরহীন চিঠিতে জানা যায় যে মওলভী বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী, ফয়েজ আলী ও ইয়াহ্ইয়া আলী (আহমদুল্লাহ্‌র দুই ভাই) এবং দিনাজপুরের জনৈক দরজী মওলভী করম আলী সুরাটের অন্তর্গত সিত্তানায় তাঁবু ফেলেছিলেন এবং বাদশাহ্ সাইয়েদ আকবরের সহযোগিতায় গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরী হচ্ছিলেন। আমি পূর্বেই বলেছি যে, সাইয়েদ আকবর সোয়াতের একজন সরকার মনোনীত রাজা ছিলেন। চিঠিতে এ রকম বর্ণনা ছিল ঃ মওলভী বেলায়েত আলীর ভাই মওলভী ফরহাত আলী আযীমাবাদে, মওলভী ফয়েজ আলীর ভাই আহমদুল্লাহ্ ও মওলভী ইয়াহ্ইয়া আলী আপন আপন বাটিতে নিজ নিজ মহল্লায় অর্থ সংগ্রহ করছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠাচ্ছিলেন। অন্যান্য চিঠি থেকে জানা যায় যে, সৈন্য ও রসদ পাটনা থেকে মীরাট ও রাওয়ালপিন্ডির মধ্য দিয়ে পাঠানো হতো। এ দু'জায়গায় আলাদা এজেন্ট নিযুক্ত থাকতো। এবং তারা সীমান্তের জেহাদের জন্যে রসদ সরবরাহের সব বন্দোবস্ত করতো।

"পাঞ্জাব সরকারের অনুরোধক্রমে পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন আলী খানের খানা তল্লাসী করে। সে ছিল আহমদুল্লাহ্‌র খানসামা এবং চিঠিপত্র তার নামেই চলাচল হতো। আসলে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রট কর্তৃক খানা তল্লাসীর দুদিন আগেই পাঞ্জাব থেকে ফেরত একজন হাকিমের (Native Doctor) মারফৎ এ খবরটা জানাজানি হয়ে যায় ও তাদের বাড়ীর যাবতীয় চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়। যাহোক, "১৮৫২ সালের ১০ই আগস্ট তারিখের রিপোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট গভর্ণমেন্টকে জানান যে, ওহাবীদের তখন বেশ সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল, এবং

মওলভী বেলায়েত আলী, আহমদুল্লাহ্ ও তাঁর পিতা এলাহী বখ্‌শের বাড়ীতে জেহাদের জন্যে সর্বপ্রকার গুপ্ত মন্ত্রণা হতো ও সেখান থেকে প্রচার কার্য চলতো। তিনি আরও জানান যে, ওহাবীদের স্থানীয় পুলিশের সংগে যোগাযোগ ছিল। তার দরুন তাঁদের কার্যকলাপের কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তাঁর নিকট যায়নি। তবে মওলভী আহমদুল্লাহ্‌র বাড়ীতে ছয়-সাত শ' সশস্ত্র লোক ম্যাজিস্ট্রেটের খানা তল্লাশীর বিরোধিতা করতে ও বিদ্রোহের নিশানা তুলতে প্রস্তুত ছিল।"

"১৮৫২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের কাউন্সিল বৈঠকে একটা বিষয় (minute) লিপিবদ্ধ করা হয়— সেটা করা হয় পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের লেখা অনুযায়ী এসব চিঠিপত্র সম্পর্কে, এবং সীমান্তের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তাও তাতে স্বীকৃত হয়। কারণ তারা বাঙালী ও হিন্দুস্তানী ওহাবীদের দ্বারা ক্রমাগত উত্তেজিত হচ্ছিল। চতুর্থ দেশীয় রেজিমেন্টের মুন্সী মুহাম্মদ ওয়ালীকে ফৌজদারীতে সুপর্দ করা হয় এবং রাওয়ালপিন্ডিতে ১৮৫৩ সালের ১২ই মে তারিখে তার বিচার ও শাস্তি হয়। তখনও মওলভী আহমদুল্লাহ্ এবং পাটনার অন্যান্য অধিবাসীদের নাম পুনরায় সাক্ষ্য প্রমাণে ওঠে এবং তাঁদের দ্বারা সীমান্তে রসদ পাঠানো বিষয়ও আলোচনা হয়।"

"অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, গভর্ণমেন্ট কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেননি এবং পাটনার ষড়যন্ত্রও নষ্ট করে দেননি। রাজদ্রোহিতার দমন নিশ্চয়ই হতো, আম্বালা অভিযানে কোনো সৈন্যক্ষয় হতো না এবং সরকারী কর্মচারীরা বহু পরিশ্রম ও অহেতুক লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পেতেন, কারণ ১৮৫২ সালের সশস্ত্র রাজদ্রোহী আহমদুল্লাহ্ই হচ্ছে এক 'সামান্য কেতাবওয়ালা' ও ১৮৫৭ সালের 'ওহাবী ভদ্রলোক'।

—(ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ১৯৮-২০০)

সারা ভারতে ১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে আহমদুল্লাহ সহ পাটনার বহু মুসলমানকে গ্রেফতার ও বন্দী করেন তদানীন্তন কমিশনার মিঃ টেইলার। টেইলার সন্দেহ করেন যে, সাতান্ন সালের আন্দোলনে এসব মুসলমান জড়িত ছিলেন। টেইলার বন্দীকৃত মুসলমানদেরকে বিনা বিচারে অতি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিকভাবে দৈনিক কিছু সংখ্যক করে তাঁর বাংলার ময়দানে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে থাকেন। কিন্তু এ নিষ্ঠুর ও অন্যায় অবিচার কর্তৃপক্ষের কানে পৌছা মাত্র অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেয়া হয়

এবং টেইলারের কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। এভাবে আহমদুল্লাহ্ টেইলারের মৃত্যুযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। এ পৈশাচিক হত্যাকান্ডের জন্যে টেইলারকে কমিশনারের পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

সাতান্নর আযাদী আন্দোলন দমিত ও প্রশমিত হলে, ইংরেজরা মুসলমানদের মন জয় করার ভূমিকা গ্রহণ করে। ওদিকে স্যার সৈয়দ আহমদও ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আহমদুল্লাহ্র প্রতিও সরকারের সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। ফলে ১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরের এক ঘোষণার দ্বারা তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিয়োজিত হন। কিন্তু তখনও পাটনার বড়ো খান্কাহ্ বা প্রধান কেন্দ্রস্থল থেকে মুলকা ও সিত্তানায় রীতিমতো মুজাহিদ ও রসদ সরবরাহ অব্যাহত ছিল। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েও আহমদুল্লাহ্ একমাত্র খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাংলা বিহার থেকে মুজাহিদ ও রসদ সংগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলতো। এ ব্যাপারে প্রধান ঘাঁটি ছিল তাঁর নিজবাড়ী। প্রত্যেক জুমার দিনে বাদমাগরিব তাঁর বাড়ীতে মিলাদের আয়োজন করা হতো এবং মীলাদের নামে সেখানে মুজাহিদগণ জমায়েত হতেন এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী নির্ধারিত করতেন। তাঁরা তাঁদের কাজকর্মের জন্যে এমন এক সংকেত পদ্ধতি (CODE) ব্যবহার করতেন যা তাঁরা ব্যতীত আর কারো বোধগম্য ছিল না। প্রত্যেকে ভিন্ন নামে নিজেদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। যুদ্ধকে বলা হতো 'মোকদ্দমা', মোহরকে 'লালমোতি।' টাকা পয়সা প্রেরণ করা হতো কেতাবের মূল্য হিসাবে। আহমদুল্লাহ 'কেতাবওয়ালা' বলে পরিচিত ছিলেন।

বাংলা ও বিহারে আহমদুল্লাহর বিশ্বস্ত, কর্মঠ ও খোদার পথে উৎসর্গীকৃত এজেন্ট ছিল। বাংলার এজেন্ট ছিলেন ঢাকার প্রসিদ্ধ চামড়া ব্যবসায়ী হাজী বদরুদ্দীন। তিনি পূর্বাঞ্চলের সমুদয় অর্থ সংগ্রহ করে পাটনার ফাগুলাল নামধারী জনৈক ব্যবসায়ীর নামে হুন্ডী করে পাঠাতেন। কোলকাতার মুড়িগঞ্জ মহল্লায় আবদুল জাব্বার নামে এবং মুকসেদ আলী নামে অন্য একজন হাইকোর্টের মোক্তার এজেন্ট ছিলেন। মুকসেদ আলীর পাটনাতেও বাড়ী ছিল। তাছাড়া, চব্বিশ পরগণা, যশোর, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রংপুর প্রভৃতি জেলাতেও এজেন্ট ছিল। বিহার, উড়িষ্যা, ইউপি ও মধ্য প্রদেশের বড়ো বড়ো শহরগুলিতেও এজেন্ট নিয়োজিত ছিল। আহমদুল্লাহ্ সাহেব সাংকেতিক ভাষায় চিঠিপত্রের

আদান প্রদান করতেন তাদের সংগে। ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত মওলবী আহমদুল্লাহ্ই ছিলেন জেহাদী আন্দোলনের প্রধান কর্ণধার। সরকারী উচ্চপদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তিনি নিরঙ্কুশভাবে এ আন্দোলন পরিচালনা করতেন এটাই ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ যে কোন বিপ্লব সফল করতে হলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের পুলিশ, সামরিক বাহিনী, প্রশাসন বিভাগ প্রভৃতির সাহায্য সহযোগিতা অপরিহার্য।

আঠারো শ' সাতান্ন সালে সমগ্র ভারতব্যাপী যে বিপ্লবী আন্দোলন চলেছিল তার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল মুজাহিদ বাহিনী, তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল মুজাহিদ বাহিনী। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার দরুন সে আন্দোলন ফলপ্রসূ না হলেও মুজাহিদগণ দমিত হননি, ভগ্নোৎসাহ হননি। তাদের কর্মপ্রেরণা হ্রাস পায়নি মোটেও। চূড়ান্ত বিজয় লাভ সম্ভব না হলেও সাতান্ন বিপর্যয়ের পরও একদশক কাল পর্যন্ত এ আন্দোলনকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন প্রায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে।

সমগ্র বাংলা থেকে হাজার হাজার মুসলমান গাজী অথবা শহীদ হওয়ার আকাংখায় পাটনা সাদিকপুরে আহমদুল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে জমায়েত হতো এবং সেখান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সিত্তানার জন্যে রওয়ানা হতো। এ রকম একটি দলের চারজন বাংলার মুসলমান আম্বালা যাওয়ার পথে গুজান খান নামক জনৈক পাঞ্জাবী সার্জেন্টের হাতে ধরা পড়ে। তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তারা নিজদেরকে নির্দোষ ও নিরীহ পথচারী বলে জানালে ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে মুক্তি দেন। গুজান খান মনে বড়ো দুঃখ পায় এবং তার এক পুত্রকে সিত্তানায় গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে পাঠিয়ে দেয়। গুজান খানের পুত্র জানায় যে থানেশ্বর নিবাসী জনৈক জাফর আলী সিত্তানায় মুজাহিদ ও রসদ পাঠানোর কাজ করেন। কর্তৃপক্ষ সংবাদ পাওয়া মাত্র জাফর আলী থানেশ্বরীর বাড়ী তল্লাশী করে এবং বহু সন্দেহজনক কাগজপত্র হস্তগত করে। জাফর আলী পলাতক হন, কিন্তু বহু মুজাহিদসহ আলীগড়ে ধরা পড়েন। তাঁদের জবানবন্দীতে জানা যায় যে, তারা সাদিকপুরের এলাহী বখ্শের গুপ্তচর। এলাহী বখ্শের খানা তল্লাসীর পরও সেখান থেকে বহু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া যায়।

এসব কাগজপত্র থেকে কর্তৃপক্ষ একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সন্ধান পায় এবং পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাভেন শ'কে তদন্তের ভার দেয়া হয়। তদন্তের সাথে সাথে

আহমদুল্লাহ সাহেবকে গ্রেফতার করা হয় এবং চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। চার মাস তদন্তের পর আহমদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি আট দফা চার্জ গঠন করে কারাগারে সুপর্দ করা হয়। বিচারে দায়রা জজ তাঁর মৃত্যুদন্ড দেন। এ দন্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোলকাতা আপীল দায়ের করা হয়। বিচারপতি ট্রিভার এবং ও লক (Trevor and O. Lock J.J) ১৮৬৫ সালের ১৩ই এপ্রিল রায় প্রদান করেন। রায়ে তারা বলেন, "প্রাণদন্ডের আদেশ অনুমোদন না করে এই আদেশ দিলাম যে তার যাবজ্জীবন দীপান্তর হোক ও তার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি রাজসরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হোক।"

ঐ বছর জুন মাসেই তাকে আন্দামান পাঠানো হয় এবং প্রায় ষোল বছর বন্দী জীবন যাপনের পর ১৮৮১ খৃস্টাব্দে এই বীর মুজাহিদ সহাস্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহ্ইয়া আলীরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কারাদন্ড হয়েছিল এবং তিনি ইতিপূর্বেই আন্দামানে এন্তেকাল করেন। আহমদুল্লাহর অন্তিম ইচ্ছা ছিল সহোদরের পাশেই সমাহিত হতে। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাঁর এ নির্দোষ ও অক্ষতিকর ইচ্ছাটুকুও পূরণ করেনি।

সাদিকপুর পরিবারের বাসগৃহটি ছিল পাটনার অতি সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত বাসগৃহ। বাসগৃহটি ভূমিসাৎ করে সেখানে পাটনার মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নির্মিত হয়। এ নির্মাণকার্যের ব্যয় বহন করা হয় এ পরিবারের অন্যান্য সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই।

সাদিকপুরের এ সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ পরিবারটি আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যেভাবে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, এবং অনুপম ত্যাগ ও কুরবানীর যে স্বাক্ষর এ পরিবারটি রেখে গেল, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। নারী ও শিশু নির্বিশেষে পরিবারের প্রতিটি সদস্য সরকারের কোপানলে তিলে তিলে দগ্ধিভূত হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, মুসলমানদের পবিত্র ও আনন্দময় ঈদের দিনে ইংরেজ সরকার আহমদুল্লাহর পরিবারকে বাসগৃহ থেকে শুধুমাত্র একবস্ত্রে ও খালি হাতে উৎখাত করে চরম আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এমন পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও অপরের ধর্মীয় উৎসব দিবসের এমন অবমাননা কোন সভ্য জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিষ্পাপ শিশু ও নারীদের নীরব আর্তনাদ ও হাহাকার সেদিন আকাশ বিদীর্ণ করেছিল। আহমদুল্লাহ্ হয়তো তাই এ দিনটিকে স্মরণ

করে নিম্নোক্ত শোকগাথাটি রচনা করেছিলেন ঃ

চুঁ শব-ই-ঈদ্রা সেহর করদান্দ্
হামারা আয্ মাকান বদর করদান্দ্
মায়া ইযায়শ্ সাযে মাতম্ সওদ্
ঈদ-ই-মা গুররা-ই-মুহররম সওদ্।

—ঈদের রাতের শেষে যখন উষার আলোক প্রতিভাত হলো, তখন আমরা সব বিতাড়িত হলাম আপন গৃহ থেকে। আনন্দের সব উচ্ছ্বাস শোকের রূপ ধারণ করলো—আমাদের ঈদ মুহররমের কারবালায় পরিণত হলো।

পৈশাচিকতার এখানেই শেষ নয়। সাদিকপুর পরিবারের সুবৃহৎ পারিবারিক কবরস্থানটি চাষ দিয়ে উৎখাত করা হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়।

মওলানা ইয়াহইয়া আলী

মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ছিলেন বিপ্লবী আহমদুল্লাহ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর অসম্পূর্ণ কাজকে পূর্ণ রূপ দেয়ার জন্যে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুজাহিদগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যেভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জাগ্রত রেখেছিলেন তা এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। এ কাজের জন্যে তিনি আপন জীবন ও ধন সম্পদ খোদার পথে বিসর্জন দিয়েছিলেন। বলতে গেলে সাইয়েদ সাহেবের শাহাদাতের পর মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীই মুজাহিদগণের আধ্যাত্মিক নেতা বা ইমাম ছিলেন। ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত জেহাদী আন্দোলন পরিচালনা করার পর তিনি অন্যান্যের সাথে ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হন।

হান্টার তাঁর গ্রন্থে বলেন, "প্রধান ইমাম ইয়াহ্ইয়া আলীর উপর বহুবিধ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ভারতে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসাবে তাঁকে অধীনস্থ প্রচারকদের সাথে নিয়মিত পত্রালাপ করতে হতো। তাঁকে এক ধরনের গোপন ভাষায় চিঠি তৈরী করতে হতো এবং এ গোপন ভাষাটা তাঁরই আবিষ্কার। প্রচুর অর্থ সীমান্তের বিদ্রোহী শিবিরে নিয়মিত পাঠাবার ব্যবস্থাটাও তাঁকেই পরিচালনা করতে হতো। মসজিদে নামাজের ইমামতি করা, ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের রাইফেলগুলি পরীক্ষা করে তাদের হাতে তুলে দেয়া, ছাত্রদের

মাঝে ধর্মীয় বক্তৃতা করা এবং ব্যক্তিগত পড়াশুনার মাধ্যমে আরবী ধর্মগুরুদের প্রবর্তিত তত্ত্বজ্ঞান আরো গভীরভাবে রপ্ত করা এ সবই ছিল তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত।"

বলতে গেলে তিনি ছিলেন একাধারে মুজাহিদ বাহিনীর পরিচালক, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দাতা, মসজিদের ইমাম, এলমে তাসাওউফের মুর্শেদ এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে সংকেত-পদ্ধতির আবিষ্কারক। আঠারো শ' চৌষট্টি সালের জুলাই মাসে আম্বালার সেশন জজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস্ যে রায় প্রদান করেন তার বরাত দিয়ে হান্টার বলেন, "ভারতে অর্ধচন্দ্রের (ইসলামী) শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে পাটনার মসজিদে তিনি (ইয়াহ্ইয়া আলী) ধর্ম বিষয়ক প্রচারণায় নিয়োজিত ছিলেন। অর্থ সংগ্রহ এবং মুসলমানদের জিহাদ পরিচালনার জন্য তিনি বহু সংখ্যক অধঃস্তন এজেন্ট নিযুক্ত করেন।"

তিনি আরো বলেন, "মামলার বিচারকার্য থেকে তিনটি সর্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার উদঘাটিত হয় তা হ'চ্ছে— ব্যাপক এলাকা জুড়ে সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সংগঠকদের বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা পরিচালনাকালে গোপনীয়তা রক্ষায় কর্মীদের দক্ষতা, এবং তাঁদের পরস্পরের প্রতি সার্বিক বিশ্বস্ততা। তাদের সাফল্যের মূলে অনেকাংশে ছিল ছদ্মনাম গ্রহণের ব্যবস্থা এবং সংবাদ আদান প্রদানের জন্যে এক ধরনের গুপ্ত ভাষার প্রবর্তন।

এ মামলার আসামী ছিলেন মোট এগারোজন। আন্দোলনের অগ্রনায়ক যারা ছিলেন তাদের বিচারে প্রাণদন্ড হয়। কিন্তু এই প্রাণদন্ডাদেশ তাঁরা এমন সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে যে তা ব্রিটিশ সরকারকে বিস্মিত করে। কারণ এসব মুজাহেদীনের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী ছিল শাসকদের দৃষ্টিভংগী থেকে ভিন্নতর। আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত বরণকে তাঁরা জীবনের বড়ো সাফল্য বলে দৃঢ়প্রত্যয় রাখতেন। তাই প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালত তাদের প্রাণদন্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে পরিবর্তিত করেন। হান্টার সাহেব উপরোক্ত সত্যটি স্বীকার করে বলেন, "ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে অগ্রনায়ক যাঁরা ছিলেন এমনকি তাঁদেরকে, শহীদ হবার সুযোগ না দিয়ে ব্রিটিশ সরকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।"

এ মামলার আসামী যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, পাটনার প্রচার কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ আবদুল

গাফ্‌ফার, জাফর থানেশ্বরী, ব্রিটিশ সেনানিবাসে মাংস সরবরাহকারী কন্ট্রাক্টর মুহাম্মদ শফি, আবদুর রহীম, এলাহী বখ্‌শ্, মুহাম্মদ হুসাইন, কাজী মিঞাজান, আবদুল করিম, থানেশ্বরের হুসাইনী এবং আবদুল গাফ্‌ফার (২)।

পাঁচ নম্বর আসামী আবদুর রহীমের বাড়ীতে বাঙালী মুজাহিদগণ জমায়েত হ'য়ে অবস্থান করতেন। খাদেম তাঁদের টাকা পয়সা জমা রাখতো, খাওয়া দাওয়া করাতো, খাতির তাজিম করতো এবং বিদায়ের সময় টাকা পয়সা ফেরৎ দিত। ইয়াহ্ইয়া আলী তাঁদেরকে জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন।

এলাহী বখ্‌শ্ সংগৃহীত তহবিল জা'ফর থানেশ্বরীর কাছে পাঠাতেন এবং তিনি তা মুল্‌কায় ও সিত্তানায় বিদ্রোহী শিবিরে পাঠাতেন।

পাটনার মুহাম্মদ হুসাইন ছিলেন এলাহী বখ্‌শের খাদেম, তিনি স্বর্ণ মোহর আস্তিনের মধ্যে সিলাই করে পাটনা থেকে দিল্লী যান এবং নির্দেশ মুতাবেক জাফর থানেশ্বরীর কাছে হস্তান্তর করেন।

কাজী মিঞাজান মুজাহিদ সংগ্রহের কাজ করতেন, অর্থ সংগ্রহ করে পাঠানো এবং চিঠিপত্র আদান প্রদানের কাজও তিনি করতেন।

আবদুল করিম ছিলেন মাংস সরবরাহকারী মুহাম্মদ শফির গুপ্তচর। তিনিও পাটনা থেকে টাকা কড়ি বহন করে নিয়ে যেতেন। মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী তাঁর 'তাওয়ারীখ-ই-আজীব' গ্রন্থে বলেছেন, মিঞাজান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী নিবাসী ছিলেন। তিনি জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেন।

থানেশ্বরের হুসাইনী— মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী ও মুহাম্মদ শফির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। একদিন ২৯০টি স্বর্ণ মোহর মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরীর নিকট থেকে বহন করে নিয়ে মুহাম্মদ শফির নিকটে যাবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন।

মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগের সময় তথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবে ভারতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়কের ইংরেজ শাসকদের নিপীড়নের মধ্যে জীবনাবসান হয়।

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত তিনজনের মধ্যে (মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, হাজী মুহাম্মদ শফি ও মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী) জাফর থানেশ্বরী অন্যতম। তিনি থানেশ্বরের

একজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুদন্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। তিনি আঠারো বৎসর আন্দামানে কারাদন্ড ভোগ করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাওয়ারীখ-ই-আজীব নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর দীর্ঘ আন্দামান জীবনের অভিজ্ঞতা, কয়েদীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার, ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের এবং জেহাদী আন্দোলনের বহু মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থে তিনি সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে ১৮৬৩ সালের আম্বালা যুদ্ধের এক চমদপ্রদ বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেনঃ

"১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ সরকারের একান্ত জবরদস্তির ফলে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জেনারেল চ্যাম্বারলেন ছিলেন ইংরেজ পক্ষের সেনাপতি। আম্বালার ঘাঁটিতে তাঁর বাহিনীকে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ পররাজ্য আক্রমণ ও সীমালংঘনেরই শামিল। সেজন্যে সোয়াতের বিখ্যাত পীর সাহেবও বহু সংখ্যক শিষ্য নিয়ে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আফগানরা দেশ ও জাতির ইজ্জৎ রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে। স্বয়ং জেনারেল চ্যাম্বারলেন গুরুতর জখম হন। প্রায় সাত হাজার ইংরেজ সৈন্য হতাহত হয়। মুজাহিদ বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার পররাজ্যের অভ্যন্তরে হলেও এ অভিযান প্রেরণ করে। মুজাহিদগণের সংকল্প হচ্ছে, হয় বিজয় নয় শাহাদাৎ। তাঁরা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে লেগে যান। কাজেই যুদ্ধ প্রচন্ড আকার ধারণ করে।

এদিকে ভারতের ভাইস্‌রয় লর্ড্ এলগিন নিজের অযৌক্তিক কার্যকলাপ ও অন্যায় আক্রমণের পরিণাম ফলের মর্মজ্বালায় কুম্বনের পর্বতশিরে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভারত বর্ষ রাজপ্রতিনিধিহীন হ'য়ে পড়ে।

যুগপৎ যুদ্ধ ও ভাইসরয়ের মৃত্যু নিঃসন্দেহে সংকট সৃষ্টি করে। এমনি সময়ে আঠারো শ' তেষট্টি সালের এগারোই ডিসেম্বর তারিখে কর্ণাল জেলার পানিপথ চৌকির ভারপ্রাপ্ত অশ্বারোহী পাঠান পুলিশ গুজান খান কোন সূত্রে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে আমার যোগসূত্র জানতে পারে। সে স্বভাবতঃই একে পদোন্নতির এক সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। তখন সে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে কর্ণালের ডিপুটি কমিশনারকে তা জানিয়ে দেয়। সে জানায়, সীমান্তে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যে

ভয়াবহ সংগ্রাম চলছে, তাতে থানেশ্বর শহরের নম্বরদার মুহাম্মদ জাফর টাকা ও লোক দিয়ে সাহায্য করে থাকে। ডিপুটি কমিশনার খবর পাওয়া মাত্র আম্বালা জেলার কর্তৃপক্ষকে, যার অধীনে থানেশ্বর শহর অবস্থিত, টেলিগ্রামযোগে এ সংবাদ জানিয়ে দেয়। সংবাদদাতা বেরিয়ে আসবার সংগে সংগেই আমার জনৈক পুলিশ বন্ধু ডিপুটি কমিশনারের বাংলোতে যান। তিনি তাঁর কাছে গোপন সংবাদটি জানতে পেরে আমাকে অবহিত করার জন্যে একজন পুলিশ অফিসারকে পাঠান, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছি বলে তিনি পরদিন প্রাতে জানাবেন মনে করে চলে যান। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার পুলিশ বন্ধুটি আশার পূর্বেই আমার বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে পুলিশ সুপার ক্যাপ্টেন পার্সন।"

(তাওয়ারীখ-ই-আজীব, বাংলা অনুবাদ 'আন্দামান' বন্দীর আত্মকাহিনী, পৃঃ ১-২)।

মওলানা ইমামুদ্দীন

বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সদর থানার অধীন হাজীপুর (সাদুল্লাপুর) গ্রামে মওলানা ইমামুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে কোলকাতা গমন করেন এবং সেখান থেকে শাহ আবদুল আযীয দেহলবীর নিকট শিক্ষাগ্রহণের জন্যে দিল্লী গমন করেন। দিল্লী অবস্থানকালে সাইয়েদ আহমদ শহীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়। কিন্তু তখন তিনি তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ শহরে পুনরায় তাঁর সাইয়েদ আহমদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এবার তিনি তাঁর হাতে 'বয়আত' গ্রহণ করে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করেন, কিছুকাল পরে সাইয়েদ সাহেব তাঁকে তাঁর খলিফা পদে বরণ করেন।

সাইয়েদ সাহেব যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে হেজাজ গমন করেন তখন মওলানা ইমামুদ্দীন কোলকাতায় স্বীয় মুর্শেদের নিকটে বিদায় নিয়ে বৃদ্ধ পিতার সংগে সাক্ষাতের জন্যে নোয়াখালী যান। অতঃপর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলীমুদ্দীন এবং ত্রিশ চল্লিশজন লোকসহ হেজাজ গমন করে সাইয়েদ সাহেবের কাফেলার সাথে মিলিত হন।

হজ্জের পর তিনি জেহাদ অভিযানে শরীক হন এবং বালাকোট প্রান্তরেও সাইয়েদ সাহেবের সাথী হন। যুদ্ধে তাঁর ভাই আলীমুদ্দীন শহীদ হন এবং তিনি

গাজীরূপে প্রত্যাবর্তন করেন। বালাকোট বিপর্যয়ের পর টংকের নবাব ওয়াজিরুদ্দৌলার আমন্ত্রণে তিনি টংক রাজ্যে গমন করেন। নবাব সাহেব তাঁর নিকটে বহু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী

সূফী নূর মুহাম্মদ চট্টগ্রাম নিবাসী ছিলেন, তাঁর বিস্তারিত জীবনী জানা না গেলেও তিনি ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদের অন্যতম খলিফা। তিনি যথারীতি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করেন, সাইয়েদ সাহেবের কাফেলাভুক্ত হ'য়ে হজ্জব্রত পালন করেন এবং জেহাদ অভিযানে শেষ পর্যন্ত সাইয়েদ সাহেবের সাথে অংশগ্রহণ করেন। বালাকোটের যুদ্ধের পর তিনিও গাজী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

পশ্চিমবংগের বিখ্যাত পীর শাহ সূফী ফতেহ আলী সাহেব সূফী নূর মুহাম্মদের নিকট এল্‌মে তাসাওউফের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সূফী ফতেহ আলী সাহেবের মাজার কোলকাতার মানিকতলায় অবস্থিত। তাঁর খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হুগলী জেলার ফুরফুরা নিবাসী মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী।

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃটিশ ভারতের প্রথম আযাদী সংগ্রাম

আঠারো শ' সাতান্ন খৃস্টাব্দে সারা ভারতব্যাপী এক প্রচন্ড ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়। শাসকগোষ্ঠী তার নাম দিয়েছে "সিপাহী বিদ্রোহ"। ১৮৫৭ সনে সিপাহী, জনতা, মুজাহেদীন মিলে যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, তাতে এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল আলোড়িত হ'য়েছিল। শাসকদের দৃষ্টিতে একে 'বিদ্রোহ' বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল বৈদেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সত্যিকার আযাদীর সংগ্রাম।

ভারতবর্ষে বিগত দুই শতকের মধ্যে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়। এ তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয় ১৭৫৭, ১৮৫৭ এবং ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে। ১৭৫৭ সনে সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ। ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে যুদ্ধ না করেও সুচতুর ক্লাইভ জয়লাভ করে এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। পলাশীর অভিযান ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফল। অবশ্য এর জন্যে মীর জাফর আলীকে দাঁড় করানো হ'য়েছিল শিখন্ডীরূপে। ১৮৫৭ সনের সংগ্রাম ছিল সিপাহী জনতার সংগ্রাম—ভারতভূমিকে স্বেচ্ছাচারী ব্রিটিশ শাসকদের গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্ত করার। তার নব্বই বছর পর ১৯৪৭ সনে ভারতীয় মুসলমানদের সংগ্রাম ছিল ব্রিটিশকে বিতাড়িত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনের অধীন না হ'য়ে নিজস্ব স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার। মুসলমান বিজয় লাভ করেছিল শেষোক্ত সংগ্রামে।

আঠারো শ' সাতান্ন সালের আযাদী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। সংক্ষেপে তার পটভূমি, সংগ্রামের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং পরাজয়ের মূল কারণসমূহ উল্লেখ করাই এ নিবন্ধের লক্ষ্য।

পটভূমিকা

এ সংগ্রামের পটভূমিকা ও কারণ নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে আরও একশ' বছর পেছনের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে হবে। পলাশীর যুদ্ধের পর

মুসলমানদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই হাতছাড়া হয়নি। বরঞ্চ তার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সত্তা, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা ও তাহজিব তামাদ্দুনও বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। মুসলিম শাসন আমলে ইংরেজ বণিকরা ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম করে। ব্যবসায় সুযোগ সুবিধা লাভের জন্যে তারা মুসলমান বাদশাহ্দের দুয়ারে ধর্ণা দিতো এবং তাঁদের করুণা লাভের আশায় দিন গুণতো। মুসলমান বাদশাহ্গণ উদার মনোভাব সহকারে তাদেরকে এ দেশে ব্যবসার পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দান করেন। কিন্তু তারা এ সুযোগের বার বার অপব্যবহার করতে থাকে। যার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে কখনো কখনো কঠোর ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হয়। এতে করে মুসলমান বাদশাহ্গণ ও মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধেই তাদের মনে এক প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। তারা এ দেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজদন্ড হস্তগত করার পরিকল্পনা করে। তাদের এ পরিকল্পনায় ইন্ধন যোগায় বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে সেই ইংরেজ বণিকরাই যখন বাংলা ও দিল্লীর মসনদ অধিকার করে বসে, তখন তারা ভারতের পূর্বতন মালিকদেরকে, যাদের কৃপায় তারা এ দেশে ব্যবসার জাল বিস্তার করতে পেরেছিল, তাদেরকে ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। মুসলমানদেরকে তাদের রাজ্য বিস্তারে প্রতিবন্ধক মনে করে তাদের প্রতি অবলম্বন করলো চরম দমননীতি। পক্ষান্তরে তাদের করুণা ও আশীর্বাদ শত ধারায় বর্ষিত হতে লাগলো হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গোটা মুসলমান সমাজকে নিষ্পেষিত ও নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করেছিল ইংরেজ শাসকগণ। মুসলমান আমলে সকল প্রকার সরকারী চাকুরীতে সিংহভাগ ছিল মুসলমানদের। ইংরেজ এদেশের মালিক মোখতার হওয়ার পর ধীরে ধীরে মুসলমানগণ সকল বিভাগের চাকুরী থেকে বিতাড়িত হতে লাগলো। শেষে সরকারের বিঘোষিত নীতিই এই হ'য়ে দাঁড়ালো যে, কোনও বিভাগে চাকুরী খালি হ'লেই বিজ্ঞাপনে এ কথার বিশেষভাবে উল্লেখ থাকতো যে মুসলমান ব্যতীত অন্য যে কেউ প্রার্থী হ'তে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত আইন পাশ করে মুসলমান বাদশাহগণ কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার জায়গীর, আয়মা, লাখেরাজ, আলতম্‌গা, মদদে মায়াশ প্রভৃতি ভূসম্পদ মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাদেরকে পথের

ভিখারীতে পরিণত করে। একমাত্র বাংলাদেশেই অন্যূন পঞ্চাশ হাজার ও ইনাম কমিশন দ্বারা দাক্ষিণাত্যের বিশ হাজার লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের বহু লক্ষ টাকা আয়ের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি সরকার অন্যায়ভাবে নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখে প্রকৃত হকদারকে বঞ্চিত করে। সরকারের এসব দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বহু প্রাচীন মুসলিম পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং বহু খান্‌কাহ, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি মুসলিম শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত আইন দ্বারা মুসলমানদের অধিকার থেকে যাবতীয় জমিদারী, তালুকদারী, ইজারা প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বন্টন করা হলো। ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলি উৎখাত হয়ে গেল। বাংলার কৃষকদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ছিল মুসলমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার শ্রেণী হলো হিন্দু এবং জমির একচ্ছত্র মালিক। কৃষককুল হলো তাদের অনুগ্রহ মর্জির উপর একান্ত নির্ভরশীল। তাদের শুধু জমি চাষের অনুমতি রইলো, জমির উপর কোন অধিকার বা স্বত্ব রইলো না। হিন্দু জমিদারগণ প্রজাদের নানানভাবে রক্ত শোষণ করতে লাগলো। জমির উত্তরোত্তর খাজনা বৃদ্ধি, আবওয়াব, সেলামী, নজরানা, বিভিন্ন প্রকারের কর প্রভৃতির দ্বারা কৃষকদের মেরুদন্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের কাছ থেকে দাড়ির ট্যাক্স, মসজিদের ট্যাক্স, মুসলমানী নাম রাখার ট্যাক্স, পূজাপার্বনের ট্যাক্স প্রভৃতি জবরদস্তিমূলকভাবে আদায় করতে লাগলো যেসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর প্রমুখ মনীষীগণ। এসব আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার অংগন থেকেও মুসলমানদেরকে বহু দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের ফলে দেশীয় শিল্পবাণিজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আবদুল মওদূদ বলেন, "দেশীয় কারিগর শ্রেণীকে নির্মমভাবে পেষণ করে দেশীয় শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনও বন্ধ করে দেয়া হয়। তার দরুন শ্রমজীবীদের জীবিকার পথ একমাত্র ভূমি কর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই খোলা রইলোনা। আর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বণিক-রাজের কুঠিগুলির আশ্রয়ে নতুন দালাল শ্রেণীর ব্যবসায়ীও জন্মলাভ করলো বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, মুন্সী, দেওয়ান উপাধিতে।

বহির্বাণিজ্যে ও অন্তর্বাণিজ্যে বণিকরাজ সবদিক দখল করে যে দালাল শ্রেণীর জন্মদান করলো, তারাও হয়ে উঠলো স্বার্থ ভোগের লোভে দেশীয় শিল্প ও কারিগরির প্রতি বিরূপ। এই নতুন আর্থিক বিন্যাসের ফলে যে নতুন ভূস্বামী ও দালাল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো, তাদের একজনও মুসলমান নয়— মুসলমানদের সে সমাজে প্রবেশাধিকারও ছিলনা এবং এই সম্প্রদায়ই ছিল বিস্তৃত গণবিক্ষোভ বা জাতীয় জাগরণের প্রধান শত্রু। এ কথা খোদ লর্ড বেন্টিংকও স্বীকার করে গেছেন—

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে সত্য, তবে এর দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশালী বড়ো একদল ধনী ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তার একটি বড়ো সুবিধা এই যে, যদি ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে শাসনকার্যের নির্বিঘ্নতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে এই সম্প্রদায়ই নিজেদের স্বার্থে সর্বদাই ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার জন্যে প্রস্তুত থাকবে।"

—[সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা, আবদুল মওদূদ (শতাব্দী পরিক্রমা), পৃঃ ৬২]।

এ সম্পর্কে আবদুল মওদূদ বলেন—

"এ মতবাদের সমর্থক এ দেশীয় লোকেরও অভাব নেই। এই সেদিনও বিশ্বভারতীতে বাংলার জাগরণ সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বলেছেন ঃ সেদিনে বাংলাদেশে অন্ততঃ বাংলার প্রাণকেন্দ্র কোলকাতায় সিপাহী বিদ্রোহের কোন প্রভাব অনুভূত হয়নি। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখার্জি এই বিদ্রোহ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের কর্মমাত্র, দেশের প্রজাবর্গের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। প্রজাকুল ইংরেজ গভর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে।"

কাজী সাহেব আরও বলেন, হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের মত যে মোটের উপর সেদিনের বাংলাদেশের মত ছিল, তার একটি ভালো প্রমাণ—বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনচেতা বাঙালীরাও সেদিন সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোন রকম কৌতূহল দেখাননি।. . .সিপাহী বিদ্রোহ সেদিনে শিক্ষিত বাঙালীকে সাড়া দেয়নি, অশিক্ষিত, হিন্দু বাঙালীকে নাড়া দেয়নি।" (সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ৫৮)।

কাজী সাহেবের মন্তব্যও ঠিক এবং হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদকের মন্তব্যও ঠিক। কাজী সাহেবের 'বাঙালী' এবং হরিশ মুখার্জির 'প্রজাকুল' বলতে হিন্দু সম্প্রদায়কেই বুঝানো হ'য়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত বাংলা ও ভারতের গোটা হিন্দু সম্প্রদায় সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। বাংলার বাইরে যেসব হিন্দু এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন, ইংরেজ সরকার তাঁদের স্বার্থে চরম আঘাত হেনেছিল। বিশেষ করে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাবে কোন দুঃখে? ব্রিটিশ সরকারই তাদেরকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, দেশের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার দ্বার তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হ'য়েছিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের স্থানে তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছিল। তারাই ছিল ইংরেজ প্রভুদের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু ও শুভাকাংখী। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল সন্দেহভাজন ও শত্রু। সুতরাং বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ তথা হিন্দু প্রজাকুল ইংরেজ গভর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ও কৃতজ্ঞ থাকবে এবং তাদের রাজভক্তি অবিচলিত থাকবে এটাই ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ কারণেই সংগ্রামে পরাজয় বরণ করার পর একমাত্র ভারতের মুসলমানরাই ব্রিটিশের রোষবহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়, তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়, সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ থেকে উৎখাত করা হয়, জেল, ফাঁসী, যাবজ্জীবন কারাদন্ড তাদেরকে ভোগ করতে হয়।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান তাঁর 'রিসালা আসবাবে বাগওয়াতে হিন্দ' নামক পুস্তিকায় 'সিপাহী বিপ্লবের' কিছু কারণ নির্ণয় করেছেন। সাইয়েদ সাহেব ছিলেন একজন ব্রিটিশ অনুগত সরকারী কর্মচারী। তিনি যে সময়ে বিজনৌরে চাকুরীরত ছিলেন, তখন বিপ্লব শুরু হয়। বিপ্লবীগণ জেলখানার দ্বার ভেঙে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করে। এ সময়ে স্যার সাইয়েদ বহু বিপন্ন ইংরেজের প্রাণ রক্ষা করেন।

স্যার সাইয়েদ আহমদ তাঁর পুস্তিকায় বিপ্লবের কারণ বর্ণনার পূর্বে একথা বলেন যে, জেহাদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীগণ এ সংগ্রামে যোগদান করেনি, তাঁর মতে যারা জেহাদের ধ্বনি তুলেছিল তারা কোন ধার্মিক অথবা শাস্ত্রবিদ ছিল না। তারা ছিল নীতিভ্রষ্ট ও মদোন্মত্ত ইতর শ্রেণীর লোক (Depraved and filthy bacchanals। সাইয়েদ আহমদের সাথে অতীত ও বর্তমানের কোন মুসলমানই একমত ছিল না এবং নয়। অবশ্য তাঁর চোখের সামনে যেসব লুঠতরাজ ও

হত্যাকান্ড হয়েছিল, তা দেখেই তিনি এরূপ মন্তব্য করে থাকবেন। তবে যারা কয়েক দশক পূর্ব থেকে মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের প্রেরণা সঞ্চারিত করে রেখেছিলেন, সাতান্নোর বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ বিপ্লব কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়নি। আপামর জনসাধারণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুদ্র আক্রোশে ফেটে পড়েছিল এবং বিভিন্ন চরিত্রের লোক এ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। যাদের মধ্যে চরিত্রের কোন বালাই ছিল না তাদের দ্বারাই লুঠ-তরাজ ও পৈশাচিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার জেহাদী মনোভাব ও প্রেরণা নিয়ে যাঁরা কয়েক দশক যাবত সংগ্রাম চালিয়েছেন তাঁদের পক্ষ থেকে এমন আচরণের কোনই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি।

যাহোক আসল কথায় ফিরে আসা যাক। সাইয়েদ আহমদ সিপাহী বিপ্লবের যে সব কারণ বর্ণনা করেন, তা নিম্নরূপ—

১। কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রচন্ড বিক্ষোভের কারণ হলো খৃস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ তৎপরতা। সকলের এটাই ছিল সাধারণ বিশ্বাস যে ইংরেজ সরকার ক্রমশঃ এবং নিশ্চিতরূপে এ দেশবাসীকে খৃস্টানধর্মে দীক্ষিত করে ছাড়বে। গোপনে গোপনে তাদের এ পরিকল্পনা এগিয়ে চলছিল এবং জনগণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার দরুন তাদেরকে একসময় খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগটি ফলাও করে প্রচার করা হয়, যখন ১৮৩৭ সালের দুর্ভিক্ষে বিরাট সংখ্যক এতিম শিশুকে খৃস্টান রূপে প্রতিপালনের জন্যে মিশনারীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১৮৫৬ সালে কোলকাতায় অবস্থিত বড়োলাটের ভবন থেকে এডমন্ড নামক জনৈক কর্মচারী কোম্পানীর সকল স্তরের কর্মচারীদের নিকটে এই মর্মে এক পত্র প্রেরণ করে খৃস্টান ধর্মের সত্যতার উপরে চিন্তাভাবনা করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করে। উপরন্তু তাদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা হয় আধুনিক যানবাহনের সাহায্যে খৃস্টধর্মের আধ্যাত্মিক বন্ধনের ভিত্তিতে ভারতীয় ঐক্যের চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্যে। স্বধর্মত্যাগের জন্যে এ এক সাধারণ আহবান বলে এর ব্যাখ্যা করা হয় এবং এ সন্দেহ প্রমাণিত হয় যখন দেখা গেল যে সরকারের পক্ষ থেকে মিশনারীদের নিয়োগপত্র এবং সরকারী তহবিল থেকে তাদের বেতন দেয়া হতে থাকে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ দরাজহস্তে মিশনারী তহবিলে অর্থ সাহায্য করতে থাকে এবং অধঃস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা নিম্ন

বেতনভুক কর্মচারীদেরকে তাদের বাড়ী গিয়ে খৃস্টধর্মের প্রচার-প্রচারণা শ্রবণ করতে বাধ্য করে। মিশনারীগণ অন্য ধর্মের প্রতি অশালীন উক্তি সম্বলিত প্রচার পুস্তিকা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যে ছড়াতে থাকে। ১৮৫৪ সালের সরকারী নীতি অনুসারে সকল মিশনারী স্কুল সরকারী সাহায্য লাভ করবে বলে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো মিশনারী স্কুল গজাতে থাকে। সরকারী কর্মচারীগণ প্রায়ই এসব স্কুল পরিদর্শনে যেতো এবং এই বলে বাইবেল পড়তে ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করতো যে খৃস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে। গ্রাম্য স্কুলগুলিতে শুধুমাত্র উর্দু পড়ানো হতো এবং আরবী ফার্সী পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল।

২। একই রান্নায় সকল সম্প্রদায়ের কয়েদীদেরকে খানা খাওয়ানো হতো। এ ছিল তাদের চিরাচরিত বর্ণ প্রথার পরিপন্থী। ১৯৫০ সালে একটি আইনের মাধ্যমে এ কথা ঘোষণা করা হয় যে স্বধর্ম ত্যাগকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে আইনতঃ দন্ডনীয়। এতে করে কারো একথা আর বুঝতে বাকি রইলো না যে এ আইনের দ্বারা খৃস্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে। ১৮৫৬ সালের একটি আইন দ্বারা বিধবা বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়। এর দ্বারা হিন্দুধর্মে আঘাত করা হয়।

৩। সুদী মহাজন শ্রেণীর অর্থ শোষণের অদম্য লালসা এবং প্রজাদের উপর অতিরিক্ত করভার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় এবং তারা ব্রিটিশ আনুগত্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। বিচার প্রার্থনার জন্যে স্ট্যাম্পপ্রথার প্রচলন সুবিচার বিক্রয় করা অথবা সুবিচার অস্বীকার করা বলে বিবেচিত হয়। কোন কোন প্রদেশে বিচারকদেরকে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

৪। কোম্পানী শাসনের অধীন লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ দ্বারা অসংখ্য পরিবার ধ্বংস করা হয়। দেশীয় শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস করা হয় এবং দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করা হয়।

৫। সর্বশেষ কারণ হিসাবে স্যার সাইয়েদ বলেন যে, মুসলমানদেরকে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরী থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী পদগুলিতে যোগ্য লোক নিয়োগই আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি এমনসব লোক দ্বারা পূরণ করা হতো— যারা ছিল 'নীচ

বংশজাত' (low form), ইতর-অমার্জিত (vulgar) ও অশিষ্ট (ill-bred)। এরা জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।

—(Muslim Separatism in India, Abdul Hamid, pp 2-4 and 6)।

সাইয়েদ আহমদ তাঁর পুস্তিকায় উপসংহারে এ বিপ্লব বিদ্রোহের সমাধান পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

. . . the solution to these difficulties lay in bringing the ruler and the ruled closer together by the admission of Indian members of the legislature to ensure that the laws passed by this body satisfied the needs of the country and were not merely academic. I do not wish to enter into the question as to how the ignorant and uneducated people of Hindustan could be allowed to share in the delibrations of the Legislative Council, or as to how they should be selected to form an assembly like the British Parliament. These are knotty points", Ibid-p. 4)।

—"ভারতীয় সদস্যদেরকে আইন সভায় গ্রহণ করে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে পারলেই এসব বিরোধের মীমাংসা হতে পারে। আইনগুলি যাতে অবাস্তব ও অকার্যকর না হয় সেজন্যে এ নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, আইন সভায় যেসব আইন পাশ হবে তা যেন দেশের প্রেয়োজন পূরণ করতে পারে। আমি অবশ্য এ বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাই না যে ভারতের অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লোকদেরকে কিভাবে আইন সভায় আলোচনার সুযোগ দেয়া হবে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় একটি আইন সভায় কিভাবে তাদেরকে বেছে নেয়া হবে।"

শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক যে মোটেই ভালো ছিল না, বরঞ্চ শাসক শ্রেণী ভারতবাসীকে ঘৃণার চোখে দেখতো তার একটি দৃষ্টান্ত আলতাফ হোসেন হালী তাঁর 'হায়াতে জাবিদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৭ সালে আগ্রায় একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর গভর্ণরের 'দরবার' অনুষ্ঠান পালিত হয়। আগরার জেলা ম্যাজিস্টেট নির্দেশ দেন যে, দরবারে ইউরোপীয়গণ ও ভারতীয়গণ পৃথকভাবে তাদের আসন গ্রহণ করবে। একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় অতিথি আসন খালি দেখে জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারীর জন্যে চিহ্নিত আসনে উপবেশন করেন।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে উক্ত আসন ছেড়ে দিয়ে আপন লোকদের মধ্যে স্থান করে নিতে আদেশ করা হয়। স্যার সাইয়েদ এতে অত্যন্ত অপমান বোধ করলেন এবং এ ধরনের বর্ণবিদ্বেষের নির্লজ্জ অভিব্যক্তিতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এ নিয়ে একজন ব্রিটিশ কর্মচারীর সাথে বেশ কথা কাটাকাটিও হলো। জনৈক থর্নহিল এতে যেন জ্বলে পুড়ে গেল এবং ক্রোধে গর্‌ গর্‌ করে বলতে লাগলো— "You did your worst in the meeting, 'How do you expect to be seated on terms of equality with us and our women folk ?" (সিপাহী বিদ্রোহে তোমরা জঘন্যতম আচরণ করেছ। এর পর কি করে আশা করতে পার যে তোমরা আমাদের এবং আমাদের মেয়ে লোকদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বসবে?) সাইয়েদ আহমদ রাগে অপমানে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান। তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এর জন্যে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তার জন্যে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়।

—(Muslim Separatismin India, A Hamid, p. 6)।

এসব বিবরণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আঠারো শ' সাতান্ন সালে সারা ভারত যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফেটে পড়েছিল, তার কারণ ছিল বহু ও নানাবিধ। শতাব্দীর পুঞ্জিভূত আক্রোশ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিসেফারিত হয়েছিল সাতান্নো সনে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ আবদুল আযীয, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ প্রমুখ বীর মুজাহিদগণ যে জেহাদী প্রেরণার সঞ্চার করে রেখেছিলেন তা যেন বারুদের স্তূপে দিয়াশলাইয়ের কাজ করলো। চারদিকে দাউ দাউ করে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে যে যেখানে পেরেছে সংগ্রামে যোগদান করেছে। সিপাহীদের অধিকাংশেরই সত্যিকার ইসলামী চরিত্র না থাকারই কথা, তাদের সাথে যোগ দিয়েছে সাধারণ মানুষ— কৃষক, মজুর, সরকারী বেসরকারী বহু কর্মচারী। কোন আদর্শবান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। উপরন্তু অনেক সুযোগ সন্ধানীও এসে ভিড়েছে এ আন্দোলনে। সে কারণে কোথাও কোথাও ইসলামী নীতি লংঘিত হয়েছে, হয়েছে লুঠ-তরাজ ও অপ্রয়োজনীয় হত্যাকান্ড। নবী মুস্তাফার (সা) জীবদ্দশায় বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণময় যুগে দেশের পর দেশ বিজিত হয়েছে, সালাউদ্দীন আইয়ুবী, নূরুদ্দীন যঙ্গী যুদ্ধের পর যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ সবের কোথাও ইসলামী নীতি লংঘিত হয়নি, মানবীয় অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ

করা হয়নি, অন্যায় ও অবাঞ্ছিত রক্তপাত করা হয়নি। সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর দীক্ষাপ্রাপ্ত অনুসারীদের দ্বারা কোন নীতিবিরোধী আচরণ পরিলক্ষিত হয়নি।

ইংরেজ সরকারের কতিপয় দমনমূলক কার্যকলাপ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। ১৮৪৩ সালে আমীরদের হাত থেকে সিন্ধুদেশ ইংরেজ সরকার গ্রাস করে। উনপঞ্চাশ সালে লর্ড ডালহৌসী গোটা পাঞ্জাব প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে ফেলেন। ইতিপূর্বে কোম্পানী সরকার এক আইন প্রণয়ন করে অপুত্রক রাজার গৃহীত দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার বাতিল করে দেয়। এই স্বত্বলোপ (Doctrine Lapse) নীতি অনুযায়ী লর্ড ডালহৌসী সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করেন। উপরন্তু আঞ্জোর, কর্ণাট প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণের দত্তক পুত্রদের বৃত্তি বন্ধ করে দেন। ১৮১৮ সালে যুদ্ধের পর রাজ্যহারা পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে কানপুরের নিকটস্থ বিঠুরে বাস করছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্রের বৃত্তি বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮৫০ সালে ডালহৌসী নবদীক্ষিত খৃস্টানদেরকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দিয়ে আইন প্রণয়ন করলে তার প্রতিবাদে একমাত্র কোলকাতা শহরের ষাট হাজার নাগরিকের স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি বড়োলাটের নিকট পেশ করে. কোন ফল হয়নি। তার ফলে জনসাধারণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে ইংরেজ সরকার এ দেশবাসীকে খৃস্টানধর্মে দীক্ষিত করতে ইচ্ছুক। ১৮৫৬ সালে ডালহৌসী মুসলমানদের শেষ স্বাধীন রাজ্য অযোধ্যা অন্যায়ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে ফেলেন, হতভাগ্য অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় ধনসম্পদ, এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর দুই লক্ষ টাকা মূল্যের হস্তলিখিত গ্রন্থাদি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রী করে কোম্পানীর কোষাগার পূর্ণ করা হয়। এর চেয়েও অধিকতর পৈশাচিক ব্যবহার ও বর্বরতা করা হয় অন্তঃপুরবাসিনী বেগমদের সাথে। তাঁদেরকে বলপূর্বক অন্তঃপুর থেকে বাইরে এনে তাঁদের মূল্যবান দ্রব্যাদি বিনষ্ট ও লুণ্ঠন করা হয়। বার্ষিক বার লক্ষ টাকার বৃত্তির বিনিময়ে নিরীহ নবাবকে কোলকাতা এনে অবরুদ্ধ করা হয়। এই পৈশাচিক কার্য সম্পাদন করতে স্যার চার্লস্ আউট্রাম্ স্বয়ং অযোধ্যায় যান। তিনি স্বীকার করেছেন যে এ নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত কাজ দেখে তাঁর নিজের রক্ষী বাহিনীর সিপাহীদের মনে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সঞ্চার হয়েছিল। এসব নিষ্ঠুরতা, মানবতাবিরোধী

কার্যকলাপ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অদম্য লালসায় নিপীড়ন নিস্পেষণ মর্মন্তুদ হাহাকার ও আর্তনাদের রূপ ধারণ করে ভারতের আকাশ বাতাস মথিত করে এবং সাতান্ন সালে বিরাট বিপ্লব রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

Annals of the Indian Rebellion, Sir J. W. Kaey প্রণীত History of the Sepoy War এবং Col. J.B. Malleson প্রণীত History of the Indian Mutiny গ্রন্থে সিপাহী বিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বিপ্লবের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায় ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন বাংলার ব্যারাকপুরে। ২২শে জানুয়ারী দমদম থেকে ম্যাস্কেটারী স্কুলের ক্যাপ্টেন রাইট (Captain Wright) জানান যে, নতুন এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ চর্বিযুক্ত করার জন্যে যেসব উপাদান ব্যবহৃত হয়, সে সম্পর্কে সিপাহীদের মনে দারুণ ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ২৮শে জানুয়ারী ব্যারাকপুর সেনানিবাস থেকে মেজর জেনারেল হিয়ার্সে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এড্জুটেন্ট জেনারেলকে জানালেন যে, কোলকাতার বিধবা বিবাহ বিরোধীদের প্রচারণার ফলে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সিপাহীদেরকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যেই এনফিল্ড রাইফেলের নতুন কার্তুজ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত আছে এবং তা দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হয়। এতে করে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে। হিয়ার্সে আরও জানান যে, রাণীগঞ্জের একজন সার্জেন্টের বাংলো এবং ব্যারাকপুর টেলিগ্রাফ অফিসসহ তিনটি বাংলো অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়েছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী হিয়ার্সে পুনরায় ভারত সরকারের সেক্রেটারীকে জানান ঃ আমরা ব্যারাকপুরে বিস্ফোরণোন্মুখ মাইনের উপর বাস করছি।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরের ১৮ নং পল্টন, প্যারেডের সময় কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। লেঃ কর্ণেল মিচেল তখন কঠোর ভাষায় সিপাহীদেরকে বলেন যে, কার্তুজ ব্যবহার না করলে তাদেরকে চীন ও রেঙ্গুনে পাঠানো হবে। সিপাহীগণ এতে অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং বিদেশে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে স্বদেশে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় মনে করে। তাদের এ অবাধ্যতার জন্যে তাদেরকে বহরমপুর থেকে ব্যারাকপুর নিয়ে গিয়ে পল্টন ভেঙে দেয়া হয়। এই ১৯ নং পল্টনের এক হাজার সিপাহীর মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ ৪০৯ জন, রাজপুত ২৫০ জন, মুসলমান ১৫০ জন এবং অবশিষ্ট ছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু।

তাদেরকে সুসজ্জিত কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে নিরস্ত্র করে ৮৫ নং গোরা পল্টনের পাহারায় ফল্‌তাঘাট পার করে দেয়া হয়। এ নিরস্ত্রীকরণ কার্য সম্পাদন করা হয় ৩১শে মার্চ।

এর থেকে বুঝা যায় যে, বাংলায় সিপাহীদের বিদ্রোহের প্রধান এবং প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate cause) হলো তাদেরকে চর্বিমিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার করতে বাধ্য করা। এ সব সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বর্ণহিন্দু ও ব্রাহ্মণ।

ইতিমধ্যে মার্চের শেষের দিকে এক সংবাদ রটলো যে, জাহাজ বোঝাই গোরা সৈন্য ব্যারাকপুর আসছে বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য। ৩৪ নং পল্টনের ৫ নং কোম্পানীর জনৈক মংগল পান্ডে এ সংবাদ শুনে ভাবলো যে, তাদের সর্বনাশের সময় আসন্ন। তখন সে উন্মত্ত প্রায় হয়ে অস্ত্র হাতে বাইরে আসে এবং সার্জেন্ট জেনারেল হিউসন ও হিয়ার্সেকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট হয়। বিচারে পান্ডের ফাঁসী হয়। ৬ই মে ৩৪ নং পল্টন পাইকারীভাবে বরখাস্ত করা হয়।

বহরমপুরের সংবাদ দ্রুতবেগে আম্বালায় পৌছে। সেখানকার ছাউনীগুলি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করা হয়। নগিনার নবাব আহমদুল্লাহ খানের নেতৃত্বে ১লা মে বিজনৌরে বিপ্লব শুরু হয়। ৩০শে মে লক্ষ্ণৌ সেনানিবাসের ৪৮ নং পল্টনের সিপাহীরা ইউরোপীয়দের বাংলোগুলি ভস্মীভূত করে দেয়। সম্মুখ সমরে স্যার হেনরি লরেন্সের সৈন্যরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ইংরেজ সৈন্যরা অগত্যা রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করে তিন মাসকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটায়।

একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, আঠারো শ' সাতান্ন সালের আযাদী সংগ্রামের বহু দৃশ্যপট যবনিকার অন্তরালে রয়েছে। সিকান্দার দারা শিকোহ বলেন ঃ

বিপ্লবের এক চরম পর্যায়ে দিলওয়ার জং মৌলভী আমদুল্লাহর প্রচেষ্টায় বিরলিজিস কাদেরকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসানো হয় এবং অভিভাবিকারূপে বেগম হজরত মহল দেশের শাসন কার্য তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন।

আহমদুল্লাহ শাহ ও হজরত মহল ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। . . .শাহ শাহেব মুহাম্মদীপুরে 'ইসলামী হুকুমত' কায়েম করেন। শাহাজাদা ফিরোজশাহ ও রাণা রাও সেই হুকুমতের উজীর নিযুক্ত হন। সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন জেনারেল বখত্ খান।

. . .কিন্তু ফিরোজ শাহ নিজেই বাদশাহ হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। ফলে আহমদুল্লাহ এখানেও বেশী দিন টিকতে পারেননি। রাজা বলদেব সিংহের আমন্ত্রণক্রমে তিনি গড়ি অভিমুখে রওয়ানা হন। একদিন বিশ্বাসঘাতকদের প্ররোচনায় তিনি হাতীর পিঠে আরোহণ করেন এবং সেই অবস্থায় শত্রুর গুলীতে শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁর শির খন্ডিত করে কোতোয়ালীতে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং দেহ খন্ড বিখন্ড করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কয়েকদিন পর আহমদপুর মহল্লায় তাঁর পবিত্র শির দাফন করা হয়। আহমদুল্লাহ শাহের হত্যাকারীকে রাজা (বলদেব সিং) পঞ্চাশ হাজার টাকা বখশিশ দেন। —(শতাব্দী পরিক্রমা, পৃঃ ১৪৭-৪৮)

সাতান্নো সালে ভারতের সংগ্রাম স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তার একটি কারণ হলো কতিপয় স্বার্থান্বেষীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ তৈরীর প্রধান কারখানা ছিল মীরাটে। সেখানে তৃতীয় অশ্বারোহীর ৮৫ জন সিপাহী নতুন কার্তুজ স্পর্শ করতে অস্বীকার করলে তাদেরকে সামরিক বিচারান্তে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় ৯ই মে কারাগারে পাঠানো হয়। পরদিন সন্ধ্যায় সিপাহী জনতার গোলাগুলীর আওয়াজে চারদিক মুখরিত হয়। তারা কারাগার থেকে ৮৫ জন শৃংখলাবদ্ধ সিপাহীকে মুক্ত করে আনে এবং ইউরোপীয়দের বাংলোগুলি ভস্মীভূত করে। এ ব্যাপারে শহর ও সদর বাজারের অধিবাসীগণই সিপাহীদের চেয়ে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করে। সাইয়েদ হাসান আলী বেরেলভী ছিলেন বিপ্লবীদের পরিচালক। উন্মত্ত জনতা-সিপাহী এখানে একটি মারাত্মক ভুল করে। তারা ইউরোপীয় দুটি রেজিমেন্ট, সেনানিবাস ও অস্ত্রগারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে রাতে দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়।

যাহোক তারা চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করে কোন প্রকারে দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তৎকালে দিল্লীতে ৩৮, ৫৪ ও ৭৪ নং তিনটি পদাতিক বাহিনী ও দুটি কোম্পানীতে মোট ৩৫০০০ দেশীয় সৈন্য এবং ৫০ জন ইংরেজ অফিসার ছিল। সকাল সাতটায় একদল বিপ্লবী অশ্বারোহী বাহাদুর শাহের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলো। ক্যাপ্টেন ডগলাস, বেসিডেন্ট ব্রেজার ও ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাবিনসন তাদের বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো। বিকেল তিনটায় বিপ্লবীগণ যখন অস্ত্রাগারের দুই স্থানে প্রবেশ করে, তখন অবস্থা

বেগতিক দেখে বারুদাগারের প্রধান লেঃ উইলোবীর আদেশে স্কালী (Scully) বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন দিল্লী নগরীতে কিয়ামত শুরু হয়। প্রচন্ড শব্দে বারুদখানা উড়ে যায়। আশেপাশের প্রায় পাঁচ শ' লোক মৃত্যুবরণ করলো। বহু অগ্নিদগ্ধ হলো। বিপ্লবীগণ তখন ক্ষিপ্ত হ'য়ে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন শুরু করলো। ধনাগার লুণ্ঠন করে ২১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা হস্তগত করা হলো এবং তা বাদশাহের হেফাজতে রাখা হলো। রাত্রে একুশটি কামান পর পর গর্জে উঠলো এবং এভাবে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের প্রতি রাজকীয় অভিবাদন (Salute) জ্ঞাপন করা হলো।

১২ই মে বাদশাহ স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে নগর পরিদর্শন করেন এবং বাজারের দোকানপাট খোলার ব্যবস্থা করেন। শাহাজাদাগণকে নগরের বিভিন্ন তোরণে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়।

১৬ই মে কয়েকজন বিপ্লবী সিপাহী একটি সীলমোহরযুক্ত গোপন পত্রে বাদশাহকে জানায় যে, বাদশাহের চিকিৎসক হাকিম আহসানউল্লাহ এবং পরিষদ নবাব মাহবুব আলী খান ব্রিটিশের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, পত্রখানি জাল। এতে করে বাদশাহ প্রতারিত হন। শাহাজাদাগণ পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক এবং পৌত্র মীর্জা আবু বকর অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক হন। অরাজকতা ও লুঠতরাজ দমনের জন্যে কয়েকটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করা হয়। শাহজাদা মীর্জা জওয়ান বখত্ প্রধান উজির নিযুক্ত হন। হাকিম আহসানউল্লাহ মীর্জা আবু বকরকে দিল্লী থেকে অপসারণের অভিসন্ধি করে মীরাট অধিনায়ক পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন। ৩১শে মে তাঁর সৈন্যরা প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের অভাবে হিন্দান নদীর তীরে ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করে।

বিদ্রোহের আগুন চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। ফিরোজপুর, বেরেলী, কানপুর, জৌনপুর, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। কানপুরের সমস্ত ইউরোপীয় সৈন্যরা দুটি সামরিক হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল। সেনাপতি স্যার হিউ হুইলার ৬ই জুন খবর পেলেন যে, বিদ্রোহীগণ আশ্রয়ঘাঁটি আক্রমণ করবে। নানা সাহেবের 'সফেদা কুঠি' বিপ্লবীদের মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছে। মন্ত্রণাদাতা ছিলেন আজিমুল্লাহ খান, সেনাপতি টিকা সিংহ, তাতিয়াটোপী, জওলাপ্রসাদ, বালরাও। বাবা ভট্ট ও মিনাবাই জাতীয় বাহিনীর

পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন। 'সফেদা কুঠি' থেকে ইউরোপীয় নারী ও শিশুদেরকে 'বিবিঘরে' স্থানান্তরিত করা হলো, কর্ণেল হ্যাড্‌লাক ৬৪ নং গোরা পল্টনসহ কানপুর অভিমুখে রওয়ানা হন। ফতেহপুরে জওলাপ্রসাদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। রণাংগনে বালরাওয়ের সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে সেনাপতি রেন্ড্ নিহত হন। বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে দেশীয় সৈন্যরা বিবিঘরে আটক নারী শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ নির্মম নীতিবিরুদ্ধ হত্যাকান্ডে মর্মাহত হয়ে আজিমুল্লাহ খান কানপুর ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌ চলে যান এবং মৌলভী আহমদুল্লাহর মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি নেপালে ইন্তেকাল করেন।

এর থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাঁরা দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করার জন্যে আল্লাহর পথে জেহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁরা অন্যায় হত্যাকান্ড ও নীতিবিরোধী তৎপরতা থেকে দূরে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল সহনশীলতা, খোদাভীতি এবং একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভ ছিল তাঁদের লক্ষ্য। "যাঁরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমালংঘন করো না। কারণ সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না"— খোদার এ বাণীর মর্যাদা রক্ষা করে তাঁরা চলবার চেষ্টা করেছেন।

যাহোক, ইংরেজরা ওদিকে মোটেই চুপ করে বসে ছিল না। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজ শুরু করলো। চীন, সিংহল ও অন্যান্য স্থান থেকে ইউরোপীয়দেরকে এবং পার্বত্য প্রদেশ থেকে গুর্খাদেরকে আনা হলো। পারস্য থেকে তিনটি বাহিনী বাংলায় আনা হলো। দিল্লীর অদূরে এক টিলায় ইংরেজ সৈন্যরা সমবেত হয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো। উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। ২৯শে মে ইংরেজ পক্ষের রাজা নরেন্দ্র সিংহের কিছু সংখ্যক শিখ সৈন্য বিপ্লবীদের দলে যোগ দেয়। তখন ইংরেজরা শিখদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে অতীত ইতিহাসের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে হীন প্রচারণা শুরু করলো যে অতীতে মুসলমান বাদশাহগণ শিখদের উপর চরম নির্যাতন করতেন। অতএব শিখদের ইংরেজের সংগে যোগদান করে তার প্রতিশোধ নেয়া উচিত। মুসলমান আমীর ওমরাহদেরকে নানা প্রলোভন দিয়ে তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির চেষ্টা শুরু করলো। এ ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতক রজব আলী ইংরেজদের সহায়ক হয়। সে সম্রাটের দরবার থেকে সম্রাট পক্ষীয় গোপন তথ্য ইংরেজদেরকে সরবরাহ করতো, হাকিম আহসানউল্লাহ্‌র সাথেও তার

আঁতাত সৃষ্টি হলো।

দুর্ভাগ্যবশতঃ দিল্লীতে প্রবল বর্ষা দেখা দিল। নগরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ঘটলো। দ্রব্যসামগ্রী মহার্ঘ হলো। ওদিকে ইংরেজরা দিল্লীর চারদিকে অবরোধ সৃষ্টি করে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দিল। ২৩ শে জুন ইংরেজরা সবজীমন্ডী দখল করলো। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বেরেলী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ বখ্‌ত্‌ খান চারটি পদাতিক বাহিনী, ৭ শত অশ্বারোহী সৈন্য, ১৪টি হস্তী, প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ দিল্লীতে উপনীত হলেন। তখন দিল্লীতে মোট সৈন্যসংখ্যা হলো ৯০,০০০। কিন্তু উজিরাবাদ অস্ত্রশালা দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় কেল্লায় গোলাবারুদের অভাব ঘটলো। তখন বেগম সমরুর মহলে বারুদ তৈরীর কারখানা তৈরী হলো। কিন্তু ৭ই আগস্ট হঠাৎ এক বিস্ফোরণে বারুদ কারখানা উড়ে গেল। হাকিম আহসানউল্লাহ্‌র এতে কারসাজি ছিল বলে সকলের সন্দেহ হলো। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই পলায়ন করেছে বলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশ্য হাকিমের গৃহ লুণ্ঠিত হলো। ৭ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতি উইলসনের নির্দেশে দিল্লীর সকল ফটকের দিকে কামান স্থাপন করা হলো। ১১ই সেপ্টেম্বর সেসব কামান থেকে প্রচন্ড গোলা বর্ষণ শুরু করলো। পুনঃ পুনঃ গোলার আঘাতে অবশেষে কাশ্মীর ফটক ধসে পড়লো। ১৮ই সেপ্টেম্বর দেওয়ানই খাসের ফটক বন্ধ করে দেয়া হলো। জেনারেল বখ্‌ত্‌ খান অসীম বীরত্ব সহকারে শত্রু নিপাত করতে থাকেন। কিন্তু মীর্জা মুগল যেখানে সৈন্য চালনা করেন সেখানেই বিপর্যয় ঘটে। ইংরেজদের গোলার আঘাতে নগর প্রাচীর দুই স্থানে ভেঙে গেল। জাতীয় বাহিনীর মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল। ২০শে সেপ্টেম্বর জেনারেল বখ্‌ত্‌ খান বাদশাহকে বল্লেন, "চারদিকেই বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র। আমাদের সকল পরিকল্পনাই শত্রুর গোচরীভূত হচ্ছে। হাজার হাজার রোহিলা এখনো প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপনি বাইরে আসুন, আমরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ জয় করব।"

কিন্তু মীর্জা এলাহী বখ্‌শ্‌ ও বেগম জিনতমহল সম্মত না হওয়ায় বাদশাহ্‌ জেনারেল বখ্‌ত্‌ খানের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। অগত্যা বখ্‌ত্‌ খান অযোধ্যায় গিয়ে আহমদুল্লাহর বাহিনীতে যোগদান করে লক্ষ্নৌ ও শাহাজাহানপুরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু চারদিকে যখন বিপর্যয়ের কালো ছায়া নেমে এলো, তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে নেপাল উপত্যকায় গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশ্বাসঘাতক হাকিম আহসানউল্লাহ খান, শেখ রজব আলী ও মীর্জা এলাহী বখ্‌শের গুপ্তচরবৃত্তির ফলেই সম্রাট বাহাদুর শাহ, বেগম জিনতমহল ও শাহাজাদা জওয়ান বখ্‌ত্‌ ক্যাপ্টেন হড্‌সনের হাতে বন্দী হন। তিনজন শাহাজাদা হুমায়ুন মক্‌বেরাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তাদেরকে বন্দী করে আনার সময় পথে নরপিশাচ হড্‌সন তাদেরকে স্বহস্তে গুলী করে হত্যা করেন। আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁদের লাশ কোতোয়ালীর সামনে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হলো। অতঃপর ইংরেজরা দিল্লী নগরী ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত করলো। নিরীহ নাগরিকদের মৃতদেহে শহরের রাজপথ ভরে গেল।

চারদিকে বিপ্লব দমনের জন্যে তারা সর্বত্র পৈশাচিক নরমেধ যজ্ঞ শুরু করলো। আলীগড়, এলাহাবাদ, লক্ষ্নৌ, বেরেলী, কানপুর, ফতেহপুর, ঝাঁসি, গোয়ালিয়র, দানাপুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি বিপ্লব কেন্দ্রগুলিতে তারা অমানুষিক উৎপীড়ন ও নিধনযজ্ঞ শুরু করলো।

চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিপ্লব শুরু করতেই ইংরেজরা অরণ্য পথে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করে। সিপাহীরা নির্বিবাদে ধনাগার লুণ্ঠন করে, বন্দীদেরকে মুক্ত করে, সেনানিবাস ভস্মীভূত করে এবং বারুদঘর উড়িয়ে দিয়ে বন্যপথ দিয়ে, সিলেট ও পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

২২শে নভেম্বর প্রাতঃকালে ঢাকা শহরে নৃশংস কান্ড অনুষ্ঠিত হয়, ইংরেজরা অতর্কিত লালকেল্লা আক্রমণ করে। সেখানে বিপ্লবীদের সাথে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়, অবশেষে বিপ্লবীগণ নদী সাঁতরিয়ে পলায়ন করে, যারা ধরা পড়লো তাদেরকে আন্তাঘর ময়দানে (বর্তমান বাহাদুরশাহ্‌ পার্ক), সদরঘাট, লালবাগ ও চকবাজারে এনে ফাঁসী দেয়া হলো।

আঠারো শ' আটান্ন সালের ২৭শে জানুয়ারী থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত বিচারে ভারতের মুসলমানদের সর্বশেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন বেগম জিনতমহল, বেগম তাজমহল, শাহজাদা জওয়ান বখ্‌ত্‌ এবং নবাব শাহ জামানী বেগম।

স্যার জন্‌ লরেন্সের নির্দেশে গঠিত একটি মিলিটারী কমিশন সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে তিনি নিজেকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস যে, গৃহস্বামী হলো দস্যু এবং দস্যু হলো

গৃহস্বামী। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্বাক্ষরকৃত এক চুক্তির মাধ্যমে ভারত সম্রাটকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার আধার বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর কোম্পানী এবং সম্রাটের মধ্যে আর কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। অতএব প্রকৃতপক্ষে সম্রাট বাহাদুর শাহই ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রকৃত আইনগত শাসক এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীই রাজকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে করেছিল নিমকহারামী ও বিদ্রোহ। অতএব যা ছিল স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রাম, কায়েমী স্বার্থের দল তার নাম দিল বিদ্রোহ। মিলিটারী কমিশনের বিচারে ভারতে কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলিম শাসনের শেষ চিহ্নটুকু চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হলো।

ভারতের এ আযাদী আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ যে ক'টি কারণে তা হলো—

এক– ইংরেজদের উন্নত ধরনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মুকাবেলায় বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুরাতন ও অসময়োপযোগী।

দুই– দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে ছিল ঐক্য ও শৃংখলার অভাব।

তিন– চট্টগ্রাম, ঢাকা, ব্যারাকপুর, বহরমপুর থেকে আরম্ভ করে দিল্লী পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লব শুরু হলেও তাদের ছিলনা কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সকলের মধ্যে কোন পারস্পরিক যোগসূত্রও ছিল না।

চার– কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের ক্রিয়াকলাপ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিপর্যয় এনেছিল। বিপ্লবীদের সকল প্রকার গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে সরবরাহ করা হতো এবং চরম মুহূর্তে দুই দুই বার বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা বারুদখানা বিস্ফোরিত হওয়ায় দেশীয় সৈন্যগণ গোলাবারুদের অভাবের সম্মুখীন হয়।

পাঁচ– দেশীয় সৈন্যদের অনেকের মধ্যে আদর্শ চরিত্রের অভাব ছিল। অনেক অবাঞ্ছিত লোক লুঠতরাজ ও অন্যায় হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের দলে যোগদান করে। তার সাথে যুক্ত হ'য়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস।

ছয়– হায়দারাবাদ, গোয়ালিয়র, নেপাল এবং শিখ প্রভৃতি শক্তিগুলি বলতে গেলে ছিল নিষ্ক্রিয় বা ইংরেজদের পক্ষে।

সাত– দেশীয় সৈন্যদের ইংরেজকে হটাও ছাড়া অন্য কোন মহান আদর্শ ছিল না। সাইয়েদ আহমদ শহীদের সময় থেকে যাঁরা এদেশে মুসলমানদের মধ্যে

জেহাদের প্রেরণা জাগ্রত করে রেখেছিলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে কোন সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই বিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং এ বিপ্লবী কর্মধারা ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এ আযাদী আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও এর পরিণাম ফল হয়েছে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। যুদ্ধকালে স্থানে স্থানে উন্মত্ত দেশীয় সিপাহীদের দ্বারা কিছু পৈশাচিক ক্রিয়াকান্ড সংঘটিত হয়েছিল সত্য। কিন্তু ইংরেজরা যে পৈশাচিকতার সাথে তার প্রতিশোধ নিয়েছে, তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট কলংকের অধ্যায় সংযোজিত করেছে। মুসলিম মুজাহেদীন তার পরও এক দশক কাল ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর ছয় দশকের পর ভারতে যে নীরব ও শান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল, তাকে বলা যেতে পারে সমাধিক্ষেত্রের নীরবতা। আযাদী আন্দোলনের জন্যে এককভাবে দায়ী করা হয় তৎকালীন ভারতের মুসলমানদেরকে। ফলে ব্রিটিশের রুদ্র আক্রোশে, তাদের অত্যাচার নিষ্পেষণে জর্জরিত হয় মুসলিম সমাজ। সুদূর বাংলা থেকে সীমান্ত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে ধরপাকড়, জেল-ফাঁসি, দ্বীপান্তর, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতির দ্বারা মুসলিম সমাজে নেমে এসেছিল সমাধিক্ষেত্রের নীরব নিথর কালোছায়া। কিন্তু তথাপি এ নীরবতা ছিল সাময়িক। সুদীর্ঘকালের সংগ্রামে মুসলমানরা স্বাধীনতা প্রেমের যে উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেছিল তা ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হ'য়ে রইলো। এই মহান আদর্শই পরবর্তীকালে ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছিল। যার ফলস্বরূপ আঠারো শ' সাতান্ন সালের নব্বই বছর পর ভারতবাসী ইংরেজের গোলামীর শৃংখল চিরতরে ছিন্ন করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু তথাপি এ সত্য অনস্বীকার্য যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদের সংগ্রাম, ফারায়েজী আন্দোলন ও তিতুমীরের সংগ্রাম, আঠারো শ' সাতান্নোর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তীকালে সীমান্তে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর ভারতের মুসলিম জাতি এক চরম দুর্গতি ও দুর্দিনের সম্মুখীন হয়। এ দুঃসময়ে স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের ভূমিকা মুসলমানদের দুর্দশা দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ব্রিটিশ সরকারের অধীনে উচ্চপদের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপরে ভারতে এক সুশৃংখল ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায়ও তারা মুসলমানদের চেয়ে বহু গুণে উন্নত। এ দেশ থেকে সহসা তাদেরকে উৎখাত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাদের সাথে এমতাবস্থায় সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের আত্মহত্যারই শামিল হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশের সমর্থন দিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের (তাদের ভাষায় বিদ্রোহের) সকল দোষ শুধুমাত্র মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের উপর পাইকারী হারে যে অমানুষিক নিষ্পেষণ চালানো হচ্ছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'আসবাব-ই বাগাওয়াতে হিন্দ' ও 'ভারতীয় মুসলমান' নামক পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের রুদ্ররোষ প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের পশ্চাদ্‌পদতাকে তিনি তাদের অবনতির কারণ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর বাণী ছিল—'আগে মূলকে রোগমুক্ত কর। তাহলেই বৃক্ষ বর্ধনশীল হবে।' ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে তিনি গাজীপুরে একটি অনুবাদ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সমিতির মাধ্যমে বহু বিদেশী গ্রন্থ অনূদিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়।

মুসলিম সমাজের উন্নয়নকল্পে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান এই যে, তিনি ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৭৫ সালে আলীগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এ কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালে সরকারী ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় মুসলমানরা সেখানে তাদের সন্তানকে পাঠাতে সংকোচ বোধ করতো। আধুনিক শিক্ষালাভের পথ থেকে সে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয় আলীগড় কলেজের মাধ্যমে।

এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যার সাইয়েদ আহমদ মুসলিম সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে

খ্যাতি লাভ করে। এ মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে কবি হালী, মুহসিনুল মুল্‌ক, নাজির আহমদ, চেরাগ আলী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ যোগদান করে আন্দোলনের অগ্রগতি সাধিত করেন।

মুসলিম স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসাবে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্যার সাইয়েদ আহমদ মুসলমানদের জন্যে পৃথক সরকারী মনোনয়ন প্রথার দাবী জানান। তিনি বলেন এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে মুসলমানদের স্বার্থ পদদলিত হবে। ১৮৮৩ সালের ১২ই জানুয়ারী গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের নিকটে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নমিনেশন প্রথার সমর্থনে তিনি বলেন ঃ "সাধারণ যুক্ত নির্বাচন প্রথার দ্বারা শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা হয়। যে দেশে শুধুমাত্র একজাতি ও এক ধর্মের লোক বাস করে সেখানে এ প্রথা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ভারতে বিভিন্ন জাতির বাস, কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ, কেউ সংখ্যালঘু এবং তাদের মধ্যে জাতিভেদ ও ধর্মভেদ বিদ্যমান। এমতাবস্থায় যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তন করলে কুফল দেখা দিতে বাধ্য। এ প্রথা প্রবর্তন করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগুলির দ্বারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ পদদলিত হবে। তাতে জাতি বিদ্বেষ ও ধর্ম বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করবে। এর জন্যে সরকারকেই দায়ী হতে হবে।"

তার এ যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব মুসলিম সমাজের জন্যে এক চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং তার এ প্রস্তাব ফলবতী হয়—ছাব্বিশ বছর পর। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের বিশিষ্ট ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর কাছে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবীতে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে এ দাবী স্বীকৃতি লাভ করে। এতে করে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে। কারণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি ছিল একজাতীয়তাবাদ। এই নিয়ে বহু বৎসর ধরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও তিক্ততা চলে। অবশেষে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনান্তে উভয় প্রতিষ্ঠানের যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ তাঁদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এটাই ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে অভিহিত। চুক্তিটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে আইন পরিষদের সদস্য

নির্বাচনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। এভাবে হিন্দু কংগ্রেস ভারতে একজাতীয়তার পরিবর্তে দ্বিজাতিত্ব স্বীকার করে নেয়, যা ছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

স্যার সাইয়েদ আহমদের প্রতিটি নীতি ও কথায় একমত হওয়া না যেতে পারে তবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করতে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস শুধুমাত্র ভারতের হিন্দু স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করবে এবং মুসলমানদের স্বার্থ হবে উপেক্ষিত। এ সত্যটি প্রথমে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো মুসলিম মনীষীগণ উপলব্ধি না করলেও স্যার সাইয়েদের সাবধানবাণীর সত্যতা তাঁদের কাছে পরবর্তীকালে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়েছিল। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তার প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং মুসলিম মানস এ পথেই অগ্রসর হয়। তাই বলতে হয়, ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার বীজমন্ত্র বহু আগেই দান করেছিলেন স্যার সাইয়েদ আহমদ।

বংগভংগ

বংগভংগ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে রাখা দরকার বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলা তথা সারা ভারতের রাজনৈতিক অংগনে হিন্দু ও মুসলমানদের পজিশন কি ছিল। ১৮৫৭ সালের পর গোটা মুসলিম সমাজদেহে যে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, সে ক্ষত তখনো শুকোয়নি এবং তার থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল। ভারতের হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারাকে পুরাপুরি গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে সুযোগ সুবিধা ষোল আনা আদায় করছিল। ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করে সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে অফিস আদালতে তারা জেঁকে বসেছিল। ব্রিটিশ সরকারের সাথে কোম্পানী শাসন থেকেই তাদের গভীর মিতালি ছিল। বিপ্লবী মুসলিম জাতিকে ভালোভাবে শায়েস্তা করার জন্যে সে মিতালি গভীরতর করার প্রয়োজন উভয়েরই ছিল। বাংলায় ফারায়েজী ও তিতুমীরের আন্দোলন, সাইয়েদ আহমদ শহীদের আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতের প্রথম আযাদী আন্দোলন, প্রভৃতির জন্যে ব্রিটিশরা মুসলমানদেরকেই দায়ী করেন। অতঃপর

তাঁরা মুসলমানদের একেবারে মূলোৎপাটন করার অথবা চিরতরে পংগু করে রাখার পরিকল্পনা করে তাদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকেন। ব্রিটিশ বিরোধী বলে অভিহিত পাটনার দ্বিতীয় মামলা ১৮৭১ সালের শেষে অথবা ১৮৭২ সালে শেষ হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা মিঃ জে, এইচ, র‍্যালীর একখানি অসংগতিপূর্ণ রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই সরকার সাত ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও অভিযুক্ত করেন। ··· পাঁচজন আসামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ডে দন্ডিত হন এবং তাদের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

—(মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৫৩)

ভারতের মুসলিম জাতির এমন সংকট সন্ধিক্ষণে সাইয়েদ আহমদ খান এগিয়ে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটিশের সাথে সংঘর্ষে মুসলমানদের কোন মংগল না হয়ে অমংগলই হবে। হিন্দুজাতি শিক্ষা দীক্ষা, চাকুরী বাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। মুসলমানদেরকে শিক্ষা দীক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। তাঁর মতে আপাততঃ সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত না হয়ে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই মুসলমান জাতির আশু কর্তব্য। অতএব সাইয়েদ আহমদ মুসলমানদের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেন এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৭৭ সালে ইংলিশ পাবলিক স্কুল ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম দেয়া হয় মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্ট্যাল কলেজ (M.A.O. College)। সাইয়েদ আহমদ ১৮৮৬ সালে মোহামেডান এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স প্রতিষ্ঠা করে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে সর্বপ্রথম তাদের চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ করে দেন।

আর্য সমাজ

অপরদিকে ১৮৫৭ সালে বোম্বাই শহরে দয়ানন্দ আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এর প্রধান কার্যালয় লাহোরে স্থানান্তরিত হয়। দয়ানন্দ ভারতে গো-সংরক্ষণ প্রচারণা শুরু করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন।

দেশে গরু জবাই বন্ধের জন্যে আর্য সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের নিকটে বিরাট আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি প্রাচীন বৈদিক বিশ্বাসের প্রতি হিন্দু সমাজকে আহবান জানান এবং ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মতো বৈদেশিক ধর্মের মূলোচ্ছেদের জন্যে জোর প্রচারণা চালান। "ভারত ভারতীয়দের জন্যে"— তাঁর এই সংগ্রামের আহবান বিরাট রাজনৈতিক পরিণাম ডেকে আনে।

—(A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 27; Farquhar : Modern Religious Movement in India, p. 205)

মুসলমানদের বেলায় ত কথাই নেই, হিন্দুদের সাথে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক কারণে গভীর মিতালি বিদ্যমান থাকলেও, শাসক ও শাসিতের মনোভাব পুরাপুরিই ছিল। Sir Bampfylde Fuller তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বলিত গ্রন্থে বলেন ঃ "কিছু সংখ্যক ইংরেজ ভারতে এসে ভদ্রতাসুলভ আচরণের প্রাথমিক রীতিপদ্ধতিও ভুলে গিয়েছিল। ইংরেজদের মহলে, রেস্তোরাঁ ও ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহে নিহত ইংরেজদের স্মরণার্থে কানপুরে একটি উদ্যান তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে কোন ভারতীয় প্রবেশ করতে পারত না। যেসব স্থানে ইংরেজরা ঘুরাফেরা করতো সেখানে ভারতীয়দের যাতায়াত বিপজ্জনক ছিল। ভারতীয়দের প্রতি তাদের ঘৃণা বিদ্বেষ এতোটা চরমে পৌঁছেছিল যে, প্রায়ই তাদের উপর বর্বরতা চালানো হতো এবং হত্যাও করা হতো। অপরাধীর কোন শাস্তিই হতো না, অথবা হলে অত্যন্ত সামান্য জরিমানা পর্যন্তই তা সীমিত থাকতো। তাদের কাছে ভারতীয়দের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না। বিনা বিচারে আসামীদের গুলী করে উড়িয়ে দেয়ার অথবা প্রাণদন্ড দেয়ার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে অফিসারদের বাড়াবাড়িও উপেক্ষা করা হতো। স্যার ব্যামফিল্ড তাঁর ডাইরীতে এ ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেন যে, যখন তিনি কানপুরের রাস্তা দিয়ে চলছিলেন তখন জেলার কর্তা রাস্তা ছেড়ে দেয়ার জন্যে পথচারীদেরকে বেত্রাঘাত করছিলেন।

—(Sir Fuller Bampfylde : Some Personal Experiences, p-56, Muorag, London-1930; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 28)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

এ ধরনের আরও ছোটো বড়ো বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে, যার ফলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ গুঞ্জরিত হচ্ছিল। এ সময়ে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। মজার ব্যাপার এই যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'অ্যালেন হিউম' নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান। তাঁর যোগ্যতা যেমন ছিল, তেমনি প্রভূত অর্থ সম্পদের মালিকও ছিলেন তিনি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠনে তাঁর যেমন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল, তেমনি এর পেছনে ছিল তৎকালীন ভারতের বড়োলাট ডাফ্রীনের (Dufferin) আশীর্বাদ। মিঃ হিউম বেঙল সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণের পর ভারতেই রয়ে যান এবং ভারতের সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উৎকর্ষ লাভের উদ্দেশ্যে একটি নিখিল ভারত সংগঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি একটি খোলাচিঠির মাধ্যমে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের কাছে আবেদন জানান একতা ও সংগঠনের জন্যে। তিনি এ কথার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, সরকার জনগণ থেকে দূরে থাকেন এবং সে কারণে তাঁরা এ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন। পুনর্গঠনের কাজ এ দেশবাসীকেই করতে হবে, বিদেশীদের দ্বারা তা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মাদ্রাজের গভর্নর প্রতিনিধিদেরকে বৈকালিক চায়ের মজলিসে আতিথ্য দ্বারা আপ্যায়িত করেন। অতএব প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেস এবং সরকারের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কংগ্রেসের দুজন অবিসংবাদিত নেতা বাল গংগাধর তিলক ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নীতি ও আদর্শ থেকে কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য জানতে পারা যায়।

বাল গংগাধর তিলক

বাল গংগাধর তিলক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পর বিগত শতকের আটের দশকে সাংবাদিকতা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে তাঁকে রাজনীতির পুরোভাগে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে বিরোধিতার পরিবর্তে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (Direct Action) নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যুদ্ধপ্রিয় মারাঠা জাতির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করে তা

কংগ্রেসের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করেন।

—(C. Y. Chintamoni : Indian Politics Since the Mutiny; p. 81, Andhara University, Waltar-1937; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 29)

বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ক'বছর পর চাকুরী থেকে অপসারিত হওয়ার পর সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। তিনি যুব সমাজকে স্বাধীন ও আক্রমণাত্মক ভাবাপন্ন হওয়ার দীক্ষা দেন।

তিলকের ভালভাবে জানা ছিল কিভাবে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগ্রত করে দিতে হয়। তিনি বহু আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুজাতীয়তা তার ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ পরিহার না করলে কিছুতেই শক্তি অর্জন করতে পারবে না। অতএব কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি তাঁর গো-বধ প্রতিরোধ সমিতির (Ati-cow-killing society) কর্মতৎপরতা প্রসারিত করেন এবং গণপতি উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে বিশেষ এক সংগীত রচনা, তার প্রকাশনা ও বিতরণের ব্যবস্থাদি করেন। ঐতিহাসিক 'হিন্দু মুসলিম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ' এবং তার 'হিসাব নিকাশের দিনের আগমনী' সম্পর্কিত বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ ছিল এসব সংগীত। তিনি উগ্র হিন্দু শ্রেণী-চেতনা জাগ্রত করেন এবং মুসলিম সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র মারাঠা বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত করেন। তিলকের গো-বধ প্রতিরোধ সমিতি মূলতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও, তার কর্মতৎপরতা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রচারক বাহিনী দেশের শহরে শহরে, গ্রামেগঞ্জে 'গো মাতার আর্তনাদ' The cry of the cow শীর্ষক প্রচারপত্র বিতরণ করতে থাকে। জনসভায় হিন্দুগণ গোহত্যার প্রতিবাদ করে প্রস্তাবাদি গ্রহণ করতে থাকেন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকে। স্বভাবতঃই তার ফলে স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলিম্ সংঘর্ষও হতে থাকে।

—(A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 45, 48)

সারাদেশে যে সময়ে এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, সে সময়ে ১৮৯৯ সালে, লর্ড কার্জন ভারতের বড়োলাট হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কোলকাতায়। প্রথম কয়েক

বৎসর কার্জন বাঙালী হিন্দুদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন প্রশাসন ক্ষেত্রে দক্ষতার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অযোগ্যতা, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা, প্রভৃতি উচ্ছেদ করে প্রশাসনের মানোন্নয়নে মনোযোগ দেন, তখন স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর প্রশংসা, মাহাত্ম্যকীর্তন ও স্তুতির পরিবর্তে নিন্দা ও সমালোচনা শুরু করে। কার্জন প্রশাসন ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তার সবগুলি, মনঃপূত না হলেও, বিনাবাক্যে গৃহীত হয়। কিন্তু তাঁর বংগভংগ প্রতিক্রিয়াশীলদের অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত করে তোলে।

বংগভংগ ছিল কার্জন প্রশাসনের সবচেয়ে সুফলপ্রদ ব্যবস্থা। কিন্তু তথাপি এ এক অশুভ পরিণাম ডেকে আনে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে, হিন্দু ও মুসলিম জাতির মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। যে মুসলিম জাতি কিছুকাল যাবত রাজনৈতিক অংগন থেকে দূরে সরে ছিল, তাদের মধ্যে পুনরায় রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। অতএব বংগভংগ ভারতীয় রাজনীতিতে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সন্দেহ নেই।

এখন আমাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগিসহ আলোচনা করা দরকার যে, বংগভংগের প্রকৃত কারণই বা কি ছিল, এবং তা অর্ধযুগ পরে বাতিলই বা হলো কেন।

বংগভংগ করা হয়েছিল সুষ্ঠু ও সুফলপ্রসূ প্রশাসনিক কারণে। বাংলা তখন ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রধান প্রদেশ ছিল। বিহার ও উড়িষ্যা এই প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং আয়তন ছিল ১৭৯,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৯,০০০,০০০। এত বড়ো একটি প্রদেশ একজন ছোটলাট বা গভর্নরের শাসনাধীন ছিল। এত বড়ো প্রদেশের সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা, আইন শৃংখলা মজবুত রাখা এবং সকল অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখা ছিল একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। বাংলার পূর্বাঞ্চল যেহেতু নদীবহুল এবং যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা না থাকায় ছোটলাটের পক্ষে এ অঞ্চল দেখাশুনা করা সম্ভব ছিল না। ছোটলাটের পাঁচ বৎসরের কার্যকালের মধ্যে একবারও এ অঞ্চল পরিদর্শন করার সুযোগ হতো না বলে, এ দিকটা ছিল অত্যন্ত অবহেলিত ও অনুন্নত। (A. R. Mallick : Partition of Bengal, p. 1-2; এম এ রহিম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০১)।

বিগত শতকের ছয়ের দশকে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে নিযুক্ত তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেন যে, বিশাল বাংলা প্রদেশের প্রশাসনিক অব্যবস্থাই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। বাংলার গভর্নর উইলিয়ম গ্রে ১৮৬৭ সালে এবং স্যার জন ক্যাম্পবেল ১৮৭২ সালে অভিযোগ করেন যে, এত বড়ো প্রদেশের শাসন কার্য পরিচালনা করা একজনের পক্ষে বড়োই কঠিন। তার ফলে শ্রীহট্ট, কাছার ও গোয়ালপাড়া একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। তবুও বাংলা প্রদেশের আয়তন বিশালই রয়ে যায় এবং শাসন পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পুনরায় ১৮৯২ সালে এবং ১৮৯৬ সালে সরকারী মহল থেকেই প্রস্তাব করা হয় যে, আসাম ও পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহ জেলাদ্বয় নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হোক। এ শতকের শেষে লর্ড কার্জন যখন বড়োলাটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তাঁর নিকটে উক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয়।

উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার পূর্বে আর একটি গুরুতর বিষয় লর্ড কার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার (Andrew Fraser) প্রস্তাব দেন যে, যেহেতু মধ্য প্রদেশের অধীন সম্বলপুরের আদালতে উড়িয়া ভাষা ব্যবহৃত হয়, অথচ সমগ্র প্রদেশে এ ভাষায় প্রচলন নেই, সেজন্যে উড়িয়া ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষা ব্যবহার করা হোক, অথবা সম্বলপুরকে উড়িষ্যার সাথে যুক্ত করে দেয়া হোক। উল্লেখ্য যে উড়িষ্যা ছিল বাংলার সাথে যুক্ত। এ প্রস্তাবও করা হয় যে, অন্যথায় গোটা উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যুক্ত প্রদেশের সাথে শামিল করা হোক।

একদিকে বাংলার গভর্নরদের পক্ষ থেকে বাংলার আয়তন হ্রাস করার প্রস্তাব এবং অপরদিকে স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের প্রস্তাব লর্ড কার্জনকে বিব্রত করে। তিনি স্বয়ং বেরারকে ব্রিটিশ ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯০২ সালের মে মাসে সেক্রেটারিয়েট ফাইলে এভাবে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন যে, বেরারের বিষয়টির সাথে বাংলার সমস্যা বিবেচনা করা যেতে পারে।

আলোচনার পর চট্টগ্রাম বন্দরকে আসামের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করা হয়। তার জন্যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, এর দ্বারা বাংলা সরকারের প্রশাসনিক গুরুভার লাঘব করা হবে, পূর্ব বাংলার জেলাগুলিতে শাসন

পরিচালনায় পরিলক্ষিত ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ দূরীভূত হবে এবং আসামের জন্যে যে সমুদ্রপথ একান্ত আবশ্যক, চট্টগ্রামের সংযুক্তিতে সে আবশ্যক পূরণ হবে। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন এ প্রস্তাব অনুমোদন করে ভারত সচিবকে অবহিত করেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে পূর্ববংগে ব্যাপক সফর করেন। চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা দু'টিকেও আসামের সাথে সংযুক্ত করার কথাও প্রস্তাবের মধ্যে শামিল ছিল বলে জনগণের মধ্যে তিনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। পূর্ব বাংলাকে আসামের অন্তর্ভুক্তকরণ জনগণ কিছুতেই মেনে নিবে না—এ কথা কার্জন স্পষ্ট উপলব্ধি করেন।

অতঃপর লর্ড কার্জন ইংলন্ড গমন করেন এবং ১৯০৫ সালের প্রথম দিকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বৃহত্তর আসাম গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কার্জনের প্রত্যাবর্তনের পর পরিকল্পনাটি ভারত সচিব ব্রডরিক সমীপে পেশ করা হয়। ব্রডরিক পরিকল্পিত নতুন প্রদেশের নাম দেন ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম (পূর্ব বংগ ও আসাম)।

—(A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 51-52)

বংগভংগ নানা ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও বিধ্বস্ত মুসলিম সমাজের জন্যে অত্যন্ত মংগলময় হলেও এর পিছনে তাদের কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। বংগভংগের পর তাদের যে প্রভূত মংগল সাধিত হতে যাচ্ছিল, তা ছিল তাদের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত। শাসন কার্য সহজ, দ্রুততর, সুষ্ঠু ও সুন্দর করার জন্যে এবং এর সুফল যাতে অবহেলিত ও অনুন্নত বাংলার পূর্বাঞ্চলও ভোগ করতে পারে তার জন্যে এ বংগভংগের পরিকল্পনা ছিল শাসকদের। মুসলমানদের নয়। এর কারণগুলি ছিল অত্যন্ত ন্যায়সংগত এবং তা নিম্নরূপঃ—

প্রথমতঃ এ অঞ্চলটি ছিল সর্বদিক দিয়ে অনুন্নত। হিন্দু জমিদারগণ এ অঞ্চলের কৃষক প্রজাদের শোষণ করে সে শোষণলব্ধ অর্থ কোলকাতায় বসে বিলাসিতায় উড়িয়ে দিতেন। প্রজাদের শিক্ষাদীক্ষা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রতি ছিল তাঁদের চরম অবহেলা ঔদাসিন্য। কোলকাতা শহর ও পশ্চিম বাংলা উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করছিল। প্রশাসন ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তার জন্যে পূর্বাঞ্চলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল। এ অঞ্চল নদীবহুল ছিল বলে নৌকা যাত্রীদের ধনসম্পদ জলদস্যুগণ নির্বিবাদে লুণ্ঠন করে

নিয়ে যেতো যার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা যেতো না। পুলিশ বাহিনী ছিল অপর্যাপ্ত ও দুর্বল যার ফলে সমাজের সর্বস্তরে অরাজকতা ও বিশৃংখলা বিরাজ করতো। প্রদেশের শাসকগণ এ অঞ্চলের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পরিহার করে বসেছিলেন এবং তাদের সকল সময় ও শ্রম কোলকাতার জন্যে ব্যয়িত হতো। পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার জন্যে কোন অর্থ বরাদ্দও করা হতো না। কর্মচারীগণ পূর্বাঞ্চলের নামে ভীত শংকিত হয়ে পড়তেন এবং পূর্বাঞ্চলে বদলী হওয়াকে নির্বাসন দন্ড মনে করতেন।

উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে বংগভংগ করা হয়েছিল। নতুন প্রদেশ আসাম, উত্তর ও পূর্ববংগ নিয়ে গঠিত হলো এবং এর আয়তন দাঁড়ালো ১০৬,৫০০ বর্গমাইল যার দুই তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান। অর্থাৎ প্রদেশটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হয়ে পড়লো। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই নতুন প্রদেশ গঠন ঘোষিত হলো এবং ১৬ই অক্টোবর থেকে এর কাজ শুরু হলো। নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller) প্রথম দিন ঢাকায় উপনীত হয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। মুসলমানগণ নতুন গভর্নরকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং হিন্দুগণ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন। নতুন গভর্নরকে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে হিন্দুগণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ক্রুদ্ধ জনতা তিনজন ইংরেজ মহিলাকে পথ চলাকালে আক্রমণ করে।

—(Fuller : Some Personal Experiences— p. 126; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 53)

হিন্দুবাংলা বংগভংগের ফলে উগ্রমূর্তি ধারণ করে। এটাকে হিন্দুমহল প্রথমতঃ 'জাতীয় ঐক্যের' প্রতি আঘাত বলে অভিহিত করে। অতঃপর নানানভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে থাকে, যথা তাদের 'রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার শাস্তি', 'মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব', এবং অবশেষে এটাকে 'মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা' নামে অভিহিত করে। রাতারাতি বংগভংগের বিরুদ্ধে হিন্দুগণ আন্দোলন শুরু করে দিলেন। 'জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলো', 'পবিত্র বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করা হলো', 'ব্রিটিশ সরকার এবং দেশদ্রোহী মুসলমানদের মধ্যে এক অশুভ আঁতাত' প্রভৃতি উত্তেজনাকর উক্তির দ্বারা বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত করা শুরু করলো বাংলার হিন্দু সমাজ।

হিন্দু আইনজীবীগণ এর আইনগত বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, বাংলা ভাষার সাহিত্যিকগণ প্রচার শুরু করলেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি চরম আঘাত হানা হলো। সমগ্র হিন্দুবাংলা এ ধরনের প্রলাপোক্তি শুরু করলো।

এ ধরনের অসংগত ও অবাস্তব প্রচারণার কারণ কি ছিল? মুসলমানদের উপরে হঠাৎ এ আক্রমণ ও অশোভন উক্তি শুরু হলো কেন? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে বংগভংগে কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন ও বেসামাল হয়ে পড়েছিল। যে সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংগালী হিন্দুগণ উভয় বাংলার চাকুরী বাকুরী ও জীবন জীবিকার উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল, তা বংগভংগের ফলে বিনষ্ট হয়ে গেল। নতুন বাংলায় মুসলমানরা হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলার পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর বশ্যতা ও পরাভব থেকে মুক্তি লাভ করলেন এবং তাঁদের মনে এ আশার সঞ্চার হলো যে, এখন স্থানীয় সমস্যাদির উপর তাঁদের কথা বলার অধিকার থাকবে। সমসাময়িক লেখক সরদার আলী খান বলেন, "যত সব হৈ হল্লা · · · এবং হঠাৎ রাতারাতি যে দেশপ্রেমের আন্দোলন শুরু হলো মাতৃভূমি অথবা ভারতের কল্যাণের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যে প্রদেশে হিন্দুগণ সুস্পষ্ট সংখ্যালঘু সেখানে তাদের শ্রেণীপ্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা ব্যতীত অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য এ আন্দোলনের নেই। (Sarder Ali Khan : India of Today, p-62, Bombay, Times Press, 1908)

বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলেন— বংগভংগের ঘোষণা আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায়। যে ১৬ই অক্টোবর নতুন বাংলার (পূর্ব বাংলা ও আসাম) সূচনা হয়, সেদিন কোলকাতায় হিন্দুগণ জাতীয় শোকদিবস পালন করেন। ঐ দিন তারা কালো ব্যাজ পরিধান করেন, মাথায় ভস্ম মাখেন, পানাহার পরিত্যাগ করে নানারূপ বিক্ষোভ ধ্বনি সহকারে মিছিল করে গঙ্গাস্নান করেন। অপরাহ্নে এক জনসভায় মিলিত হয়ে তাঁরা বংগভংগ রদের শপথ গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে বলেন ঃ "যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই লেফট্ন্যান্ট গভর্নরের শাসনাধীন ছিল। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় ব্রিটিশ সরকার অনেকদিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। বড়লাট লর্ড কার্জন অবশেষে ভারত

সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বংগ বিভাগের অনুকূলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ হওয়া মাত্রই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। দূর মফঃস্বলেও বংগভংগের বিরোধিতা করিয়া সভাসমিতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইতে থাকে।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৭৭)।

বংগভংগ বিরোধী আন্দোলন কিভাবে বিস্তৃতি লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করে তার উল্লেখ করে ওয়ালিউল্লাহ বলেন—

"· · · আন্দোলন শহর হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। নেতৃস্থানীয় বিপ্লববাদীরা একটু দূরে থাকিয়া ভাবপ্রবণ ছাত্র সমাজ হইতে সদস্য সংগ্রহ পূর্বক তাহাদের দলের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ্যের চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। বিপ্লবীরা তাঁহার নিকট নতুন প্রেরণা লাভ করে। শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার সাহায্যে দেশের সর্বত্র বিপ্লবের বীজ ছড়াইতে থাকেন।" —(আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৭৯)।

কতিপয় মুসলমান হিন্দুদের প্রচার ও তথাকথিত দেশপ্রেম আন্দোলনে বিভ্রান্ত হয়ে বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, বালগংগাধর তিলক প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ শিবাজীকে আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুজাতির সুপ্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগ্রত করতে লাগলেন, তখন তাঁরা বংগভংগের সুদূরপ্রসারী মংগল ও তার বিরোধিতার মূল রহস্য উপলব্ধি করে আন্দোলন পরিত্যাগ করেন। এ প্রসংগে আবদুল মওদূদ তাঁর "মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর" গ্রন্থে বলেন— "কিন্তু এই বংগভংগ বিভাগকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় যে তুমুল আন্দোলন করে, তার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলি ও বেতনভুক সাংবাদিকরা। নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র ও ডিসপ্যাচ্সমূহে যেসব পরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হতে লাগলো 'দি টাইমস' ও 'মানচেস্টার গার্জেনে' তাতে ব্রিটিশ জনমত বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লো সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়ে। টাইমস পত্রিকায় বংগভংগকে সমর্থন করে ও কার্জনের কার্যাবলীকে পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে সুন্দর সুন্দর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; মানচেস্টার গার্জেনে বিভাগকে নিন্দা করে

গরম গরম প্রবন্ধ বের হ'তে থাকে, নিজস্ব সংবাদদাতার লোমহর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে আন্দোলন সম্পর্কে ও বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে। কটন, নেভিন্সন্ ও হার্ডি বিক্ষোভকে সমর্থন করে বিবৃতি প্রচার করতে থাকেন। নেভিন্সন্ ছিলেন মানচেস্টার গার্জেনের কলকাতাস্থ রিপোর্টার ও কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ লোক। তিনি বিলেতে এক কৌতুকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করেন ঃ 'জাতীয় অন্যায়ের বার্ষিকী পালনটা ভারতের 'ভস্মবধুবারে' পরিণত হয়েছে। ঐদিন সহস্র সহস্র ভারতীয় কপালে ভস্মের তিলক ধারণ করে। প্রভাতে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নীরবে গংগাস্নান করে ও উপবাস করে। গ্রামে, শহরে, বাজারে সব দোকানপাট বন্ধ করে, স্ত্রীলোকেরা রান্না করে না ও অলংকার প্রসাধন ত্যাগ করে। পুরুষগণ পরস্পর হাতে হলদে সুতার রাখীবন্দ করে লজ্জার এ দিনটিকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে এবং সারাদিনটি প্রায়শ্চিত্তে, শোক পালনে ও উপবাসে কাটায়। (The New Spirit of India, pp. 167-70)

জনৈক ব্যারিস্টার আবদুর রসূল ও কতিপয় মুসলমান ব্যক্তিগত স্বার্থে এ আন্দোলনে যোগদান করেন। সেটাকে ফলাও করে বলা হয়, বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শরীক ছিল। এ সম্পর্কে আবদুল মওদূদের প্রকাশিত তথ্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"মিঃ রসূল ১২৫ টাকা, নোয়াখালীর লিয়াকত হোসেন ৬০ টাকা, ও মাদারীপুরের জনৈক দিলওয়ার আহমদ ৪০ টাকা মাসিক ভাতায় কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের নিকট আন্দোলন প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন, সমসাময়িক পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায়। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল ঃ Mr. Rasul is a Muslim Leader of the Hindus (মিঃ রসূল হিন্দুদের মুসলমান নেতা)।

—(আবদুল মওদূদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২৮২)

মজার ব্যাপার এই যে, ১৯০৭ সালের শেষের দিকে মিঃ হার্ডি এ দেশে আসেন আন্দোলন দেখার জন্যে। তিনি বাংলায় পৌছলে 'অমৃত বাজার' পত্রিকা প্রচার করে, "লোকে তাঁকে দেখে আনন্দে উন্মত্ত হয়েছে। এবং ঈশ্বর তাঁকে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র ফাঁস করতে প্রেরণ করেছেন।"

এভাবে হিন্দুদের নিকটে 'ঈশ্বর প্রদত্ত দেবতা' হার্ডি তাদের অসীম শ্রদ্ধা ও গরম গরম সম্বর্ধনা লাভ করে দেশে ফিরে গিয়ে বলেন— হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বংগভংগ বিভাগের তীব্র বিরোধী। সিরাজগঞ্জে তিনি

মুসলমানদের মুখে 'বন্দেমাতরম' গান শুনেছেন, বরিশালে হিন্দু মুসলমান উভয়ে তাঁকে এ গান শুনিয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক তাঁকে দু'একজন মুসলমানের নাম করতে বললে তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত গোপনীয়। তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে আবদুর রসূলের নামটাও হয়তো তার জানা ছিল না। টাইম্‌স্ পত্রিকা তাঁকে তীব্র র্ভৎসনা করে ও অন্যান্য সংবাদপত্রে তাঁকে 'মূর্খ', 'হাস্যাস্পদ', 'বিদূষক ও পাগল' উপাধিতে ভূষিত করে।

— (আবদুল মওদূদ ঃ ঐ পৃঃ ২৮২-৮৩)

বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের যে সমর্থন ছিল না তার জ্বলন্ত প্রমাণ ঢাকার খাজা সলিমুল্লাহ ও মুসলিম বাংলার তৎকালীন উদীয়মান নেতা এবং পরবর্তীকালের শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বক্তৃতা বিবৃতি। বংগভংগ রদ ঠেকাবার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে খাজা সলিমুল্লাহ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি যে উক্তি করেন তাতে বাংলার মুসলমানদের অসন্তোষ বিক্ষোভই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, বংগভংগ রদের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে চরম আঘাত লেগেছে এবং তাদের ঘরে ঘরে বিষাদের সঞ্চার হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, বংগভংগের ফলে অনুন্নত পূর্ব বাংলা ও আসামের অবহেলিত অধিবাসীগণ যে সুযোগ পেয়েছিল, এবং বিশেষ করে মুসলমানদের উন্নতির যে সুযোগ তা সহ্য করতে না পেরে বিভাগ বিরোধীরা বংগভংগ বানচাল করার জন্যে রাজদ্রোহিতা মূলক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে করে, তিনি বলেন, ব্রিটিশ সরকার এ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন। নবাব সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "এতদিন সমগ্র প্রাচ্যে মনে করা হতো যে যাই ঘটুক না কেন ব্রিটিশ সরকার কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না। যদি কোন কারণে এ বিশ্বাস খর্ব হয়, তাহলে ভারতে ও প্রাচ্যে ব্রিটিশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।"

—(ডাঃ এম এ রহিম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০৯-১০, A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 94-95)

নবাব সলিমুল্লাহ উক্ত অধিবেশনে আরও বলেন ঃ

"বাংলা বিভাগে আমরা তেমন বেশী কিছু লাভ করিনি। কিন্তু তবুও তা আমাদের দেশবাসী অন্য সম্প্রদায়ের সহ্য হলো না বলে তারা তা আমাদের কাছ

থেকে কেড়ে নিতে আকাশ-পাতাল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। খুন খারাবি ও ডাকাতির মাধ্যমে তারা প্রতিশোধ নেয়া শুরু করলো। তারা বিলেতী দ্রব্যাদি বর্জন করলো। এ সবকিছুই সরকারের কাছে অর্থহীন ছিল। মুসলমানরা এসব অপরাধ যজ্ঞে শরীক না হয়ে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। ··· মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় এ বিভাগে লাভবান হয়েছিল। তাদের হিন্দু জমিদারগণ তাদেরকে বিরোধিতার সংগ্রামে টেনে আনবার চেষ্টা করে। এতে তারা কর্ণপাত করেনি। ·· ·· এতে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ বাধে। ··· সরকার দমননীতি অবলম্বন করেন। তাতেও লাভ হয়নি। একদিকে ছিল ধনশালী বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়। অপরদিকে ছিল দরিদ্রমুসলমান— যারা সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। এভাবে চলে বছরের পর বছর। হঠাৎ সরকার বংগভংগ রদ করে দেন প্রশাসনিক কারণে। ··· এর আগে আমাদের সাথে কোন পরামর্শও করা হয়নি। আমরা সব কিছু নীরবে সহ্য করেছি।" অতঃপর সরকার দিল্লী দরবারে তাঁকে যে জি সি আই ই উপাধিতে ভূষিত করেন, তার জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে এ উপাধিকে ঘুষ ও তাঁর গলায় অপমানের বন্ধন বলে গণ্য করেন। —(A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 92; আহমদ ঃ রুহে রওশন মুস্তাক্‌বেল, পৃঃ ৫৮-৫৯)

পরবর্তীকালে মওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন ঃ

পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের শাসকদের যুদ্ধে নামানো হ'য়েছিল ··· ·· এবং যখন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আর সুবিধাজনক রইলো না, তখন তারা সন্ধি করে বসলো সুবিধাজনক গতিতে।

ইতিহাসের এর চেয়ে ঘৃণ্যতর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ সদ্যলব্ধ অধিকারসমূহ কেড়ে নেওয়া হলো এবং সন্তোষ প্রকাশকে চরম অপরাধ গণ্য করে শাস্তি দেয়া হলো।

—(Iqbal : Select Writings and Speeches, p. 262)

বংগভংগের ফলে পূর্ববাংলার হতভাগ্য মুসলমানদের সুযোগ সুবিধার আশার আলোক দেখা দিয়েছিল। বংগভংগ রদ করে তা নস্যাৎ করার যে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিল হিন্দুবাংলা, তাতে দূরদর্শী মুসলিম রাজনীতিবিদগণ আতংকিত হয়ে পড়লেন। হিন্দুদের চক্রান্ত উন্মোচন করে বাংলা তথা ভারতের মুসলিম স্বার্থ

সমুন্নত করার জন্যে ভারতের সকল মুসলমান চিন্তাশীল ও রাজনীতিবিদগণ চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকা শহরে নিখিলভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন নাম দিয়ে এক সম্মেলন আহবান করেন। মুসলমানদের সংকট মুহূর্তে এমন সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সকলে উপলব্ধি করলেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আট হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহসিনুল মুলক, ভিখারুল মূলক, আগা খান, হাকিম আজমল খান ও মওলানা মুহাম্মদ আলী। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং 'মুসলিম লীগ' নামে একটি পৃথক দল গঠিত হয়। কারণ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে এ দলটির লক্ষ্য শুধু হিন্দুস্বার্থ সংরক্ষণ ও মুসলিম স্বার্থ দলন। বিভাগকে বানচাল করার জন্যে নানান অপকৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। কোলকাতায় বর্ণহিন্দুদের ঘনো ঘনো বৈঠকে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাঙালী জাতিকে নির্মূল করার জন্যে বংগমাতাকে দ্বিখন্ডিত করেছে, বাঙালী কৃষককুলকে আসামের চা বাগানে কুলিমজুর হিসাবে নিয়োগ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। অতএব হে বাঙালী জাতি। 'বংগভংগ রদকে' বাঙালীর 'মুক্তি সনদ' হিসেবে গ্রহণ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। যারা 'মুক্তি সনদে' বিশ্বাসী নয় তারা বাঙালী নয়, বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজের দালাল। মুসলিম লীগ অধিবেশনে নবাব সলিমুল্লাহর উপর অর্পিত হলো বাংলার মুসলমানদেরকে হিন্দুদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত 'মুক্তিসনদ' আন্দোলন থেকে দূরে রাখার দায়িত্ব। ফলে বর্ণহিন্দুদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়লো খাজা সলিমুল্লাহর উপর। শুরু হলো ফ্যাসিবাদী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। খাজা সাহেব বরিশাল ভ্রমণ করলে তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়, তাঁকে ইংরেজের দালাল, 'বাংলার দুশমন' বলে গালি দেয়া হয়। কুমিল্লার জনসভায় তাঁকে আক্রমণ করা হয়। তাঁকে নিয়ে হোসামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রশিক্ষক ও মুসলিম জনগণ শোভাযাত্রা করা কালে যোগীরাম পাল নামক জনৈক হিন্দু কর্তৃক একটি দোতলার বারান্দা থেকে একটি ঝাড়ু দেখিয়ে দেখিয়ে অপমান করা হয়। রাজগঞ্জের রাস্তা অতিক্রমকালে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়া হয়। তিনি প্রাণে রক্ষা পেলেও সাঈদ নামে জনৈক যুবক প্রাণ হারায়। বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাহ্যতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে হলেও এর দ্বারা 'এক ঢিলে দুই পাখী' মারার লক্ষ্যই আন্দোলনকারীদের ছিল। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে

ইংরেজদের দালাল হিসাবে চিত্রিত করে তাদের নির্মূল করা এবং ইংরেজদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া।

১৯০৮ সালে ৩০শে মে কোলকাতার যুগান্তর পত্রিকা হিন্দুদের প্রতি এক উদাত্ত আহবান জানিয়ে বংগমাতার খন্ডনকারীদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। বলা হয়, "মা জননী পিপাসার্ত হয়ে নিজ সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করছে, একমাত্র কোন্ বস্তু তার পিপাসা নিবারণ করতে পারে। মানুষের রক্ত এবং ছিন্ন মস্তক ব্যতিত অন্য কিছুই তাকে শান্ত করতে পারে না। অতএব জননীর সন্তানদের উচিত মায়ের পূজা করা এবং তার ইপ্সিত বস্তু দিয়ে সন্তুষ্টি বিধান করা। এসব হাসিল করতে যদি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়, তবুও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত হবে না। যেদিন গ্রামে গ্রামে এমনিভাবে মায়ের পূজা করা হবে, সেদিনই ভারতবাসী স্বর্গীয় শক্তি ও আশীর্বাদে অভিষিক্ত হবে।"

—(ইবনে রায়হান ঃ বংগভংগের ইতিহাস–পৃঃ ৬–৭)।

বংগমাতাকে খুশী করার জন্যে যে উদাত্ত আহবান জানানো হলো, তার পর শুরু হলো হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও রক্তের হোলিখেলা।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে বলেন, "কলিকাতা এবং ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ বিপ্লব আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার বিপ্লববাদীরা 'যুগান্তর' এবং ঢাকার বিপ্লববাদীরা 'অনুশীলন' নাম দিয়া তাহাদের সমিতি গঠন করেন। সাধারণতঃ এই দুইটি সমিতির সদস্যগণই বোমা তৈরী ও আগ্নেয়াস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিতেন। ইহার পর অন্যান্য নামেও মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল।"

—(মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৮০)

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বংগভংগের তীব্র নিন্দা করে বলেন, বাংলাদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্ত করা হয়েছে। বংগভংগের প্রতিবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৬ সালের ৭ই আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে। বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হয় এবং আগুন লাগানো হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শিক্ষাংগন পরিত্যাগ করে। বালগংগাধর তিলক বংগভংগের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তা জাগ্রত ও সুসংহত করার জন্যে মারাঠা নায়ক শিবাজীকে ভারতের সকল হিন্দুদের জাতীয় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠার

আয়োজন করেন। দেশের সর্বত্র শিবাজীর জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপালিত হয়। সভায় সভায় কংগ্রেসের নেতাগণ মুসলমান সম্রাটের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রামের প্রশংসা করতে থাকেন। শিবাজীকে হিন্দুদের জাতীয় বীর ও তাঁর সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। এ সময় বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গড়ে উঠে। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদেরকে হত্যা করে বংগভংগ রদ করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য। —(এম এ রহিমঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০৫-৬; সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঃ নেশন্ ইন্ মেকিং, ১৮; এ হামিদ ঃ মুসলিম সেপারেটিজম্ ইন্ ইন্ডিয়া, ৫৭, ৬৯-৭০)।

বংগভংগের পর হিন্দুবাংলা মুসলমানদের প্রতি এতখানি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে সংবাদপত্রে এবং জনসভায় মুসলমানদের প্রতি নানারূপ অসম্মানকর ও বিদ্রূপাত্মক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা হতে থাকে। মুসলমানদের অতীত বর্বরতার বিবরণসহ কল্পিত ইতিহাস লিখিত হয়। সাইয়েদ আহমদ খানকে দেশদ্রোহী এবং মুসলমানদেরকে ইংরেজের দালালরূপে চিহ্নিত করা হয়। ··· প্রতিদিন সংবাদপত্রে এ ধরনের সংবাদ পরিবেশ করা হয় যে, সরকার হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাতে মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করছেন এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করছেন। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার জন্যে হিন্দুদেরকে আহবান জানানো হয়। একটি সংবাদপত্র এতদূর পর্যন্ত বলে যে মুসলিম গুন্ডাদেরকে এবং তাদের সাহায্যকারী সরকারী কর্মচারীদেরকে জীবন্ত দগ্ধিভূত করলেও হিন্দু সমাজের প্রতিশোধ গ্রহণ যথেষ্ট হবে না। —(Khan, India of Today, p. 87; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 61)

মিঃ এন সি চৌধুরী বলেন, বংগভংগ হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক চিরদিনের জন্যে বিনষ্ট করে দেয় এবং বন্ধুত্বের পরিবর্তে আমাদের মনে তাদের জন্যে ঘৃণার উদ্রেক করে। রাস্তাঘাটে, স্কুলে, বাজারে সর্বত্র এ ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট হয়। স্কুলে হিন্দু ছেলেরা মুসলমানদের নিকটে বসতে ঘৃণা প্রকাশ করে এই বলে যে তাদের মুখ থেকে পিঁয়াজের গন্ধ বেরুচ্ছে। মিঃ চৌধুরী বলেন যে, তিনি স্কুলে গিয়ে এ আচরণ স্বচক্ষে দেখেছেন। ফলে ক্লাশে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরও বলেন, "আমরা লেখাপড়া শিখবার আগেই

আমাদেরকে বলা হতো যে এককালে মুসলমানরা এ দেশ শাসন করতে গিয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। এক হাতে কোরআন এবং অন্য হাতে তরবারী নিয়ে এ দেশে তারা ইসলাম জারী করেছে। মুসলমান শাসকগণ আমাদের নারী হরণ করেছে, মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের ধর্মীয় স্থানসমূহ অপবিত্র করেছে। অতএব বংগভংগই মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেনি। এ ছিল বহু পূর্ব থেকেই। বংগভংগ তা বর্ধিত করেছে মাত্র।

—(N. C. Chowdhury: The Auto-biography of an Unknown Indian pp. 227, 230; Zuberi : TAZKIRA WADAR. p. 169-70; A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 61-62)

বংগভংগ রদ করার জন্যে উভয় বাংলার হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়েছে বলে বিকৃত, কাল্পনিক ও উদ্ভট ইতিহাস পরিবেশন করে পরবর্তী বংশধরগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এ কথাও বলা হয় যে, এক খাজা সলিমুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বাংগালী মুসলমান বংগভংগ মেনে নেয়নি। এ প্রকৃত সত্যের অপলাপ ব্যতীত কিছু নয়। উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বংগভংগের ফলে অবহেলিত মুসলমান সমাজের আশা-আকাংখা প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বলে হিন্দুবাংলা নিছক হিংসা পরবশ হয়ে বিভাগ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। তাদের বক্তৃতা বিবৃতি, তাদের আচরণ, মারাঠা নেতা শিবাজীকে দৃশ্যপটে টেনে এনে হিন্দু জাতীয়তা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও মিলনকে নস্যাৎ করে দিয়েছে, চারদিকে দাংগা হাংগামা শুরু হয়েছে, মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে। এতসবের পর হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে বংগভংগ রদ করেছে এ কথা বলা মস্তিষ্ক বিকৃতিরই পরিচায়ক অথবা দুরভিসন্ধিমূলক সন্দেহ নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বংগভংগের ফলে বাংলায় যে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করেছিল বাংলার হিন্দুগণ, যার প্রতি মুসলমানদের কোন সমর্থন ছিল না, বরঞ্চ মুসলমানদের জীবন ও ধনসম্পদ বিপন্ন হয়েছিল, সে সন্ত্রাসবাদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং সে সংকটসন্ধিক্ষণে মুসলমানদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহূত হয়। এ সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত করার পিছনে বাংলার মুসলমানদের তৎকালীন উদীয়মান

নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হকের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। উক্ত সম্মেলনের জন্যে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এ, কে, ফজলুল হক ও ভিখারুল মুলক। সম্মেলনকে জয়যুক্ত করার জন্যে ৩৩ বৎসর বয়স্ক যুবক এ, কে, ফজলুল হক প্রভৃত উৎসাহ উদ্যমসহ সারা ভারত সফর করেন যার ফলে সম্মেলনে ৮০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ সম্মেলনেই বাংলা তথা সারা ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে এবং জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বলতে গেলে বংগভংগের ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে হিন্দু বিদ্বেষ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তাই মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিল। ফজলুলহক তারপর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। কারণ ১৯০৬ সালেই তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৯১১ সাল পর্যন্ত সরকারী চাকুরী করেন। ১৯১১ সালে চাকুরী ইস্তফা দেয়ার পর খাজা সলিমুল্লাহর পরামর্শক্রমেই তিনি কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১৩ সালে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ঢাকা বিভাগ নির্বাচনী এলাকা থেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রায় বাহাদুর কুমার মহেন্দ্র মিত্রকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জয়যুক্ত হন। অতঃপর ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বাজেট অধিবেশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বিভাগ রদের তীব্র সমালোচনা করেন।

একথা অনস্বীকার্য যে এ কে ফজলুল হককে বাদ দিয়ে বাংলার মুসলমান বলে আর কিছু চিন্তা করা যায় না। অতএব তিনি যখন বংগভংগের সপক্ষে ছিলেন এবং বংগভংগ রদের বিরুদ্ধে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, তখন এ কথা অবিশ্বাস্য, হাস্যকর ও চিন্তার অতীত যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে বংগভংগ রদ আন্দোলন পরিচালনা করে।

বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ কে ফজলুল হক সাহেবের বক্তৃতায় এ কথা অধিকতর সুস্পষ্ট হয় যে বংগভংগ রদ ছিল মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং এর দ্বারা তাদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করা হয়। ১৯১৩ সালে ৪ঠা এপ্রিল, বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯১৩-১৪ সালের বাজেট অধিবেশনে বাংলার মুসলমানদের জনপ্রিয় নেতা জনাব এ কে ফজলুল হক তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বলেন,

"I would only remind the officials that they are in honour bound to render adequate compensations to the Muslim Community for all the grievous wrong inflicted on them by the unceremonious annulment of the partition . . . Our share we claim as our indevisible right, and the excess we claim by way of compensation for the wrong done to us by the annulment of the partition. This is the view of the general Muslim public, and if the officials will not meet the demands in full, there is certain to be discontent in the community."

—(Budget Speech of Mr. A. K. Fazlul Huq, Bengal Legislative Council, dated 4th April, 1913 : Bangladesh Historical Studies-Journal of the Bangladesh Itihash Samiti, vol 1, 1976, p. 148)

—আমি সরকারী কর্মচারীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, লৌকিকতাহীনভাবে বংগভংগ রদ করে তাঁরা মুসলিম সমাজের প্রতি যে মর্মান্তিক অত্যাচার করেছেন, তার যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে তাঁরা নীতিগতভাবে বাধ্য। . . . অখন্ডনীয় অধিকার হিসাবে আমরা আমাদের অংশ দাবী করছি এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে অতিরিক্ত দাবী আমরা এ জন্যে করছি যে বিভাগ রদ করে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। এ দাবী হচ্ছে মুসলিম জনসাধারণের এবং এ দাবী পূরণ করা না হলে মুসলিম সমাজের বিক্ষুব্ধ হওয়া সুনিশ্চিত।"

বাঙালী মুসলমানদের নেতা জনাব ফজলুল হকের উপরোক্ত বাজেট বক্তৃতায় বাংলার মুসলমান জনগণের অন্তরের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। বংগভংগ রদ করে মুসলমানদের প্রতি যে চরম অন্যায় করা হয়েছিল এবং এতদ্বারা মুসলমানগণ যে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, সে বিক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল হক সাহেবের উপরোক্ত বক্তৃতায়। এর পর কি করে বলা যেতে পারে যে বংগভংগ ছিল মুসলমানদের কাছে অবাঞ্ছিত? এবং বংগভংগ রদের জন্যে তারা এমন শ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়েছিল যাদের মুসলিম বিদ্বেষ এবং মুসলিম দলন নীতি ও কর্মসূচী বাংলা তথা সারা ভারতে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল?

বংগবিভাগের পর হিন্দুদের একচেটিয়া স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা বিঘ্নিত হয়েছিল বলে গোটা হিন্দু বাংলা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এবং বলতে গেলে সারা ভারতের হিন্দুজাতি এ বিভাগ বানচাল করার জন্যে যেভাবে স্বর্গমর্ত আলোড়ন শুরু করেছিল এবং একসাথে মুসলিম ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ শুরু করেছিল, তাতে ইংরেজগণ অতিমাত্রায় বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়েন কারণ ভারত ও বাংলার প্রকৃত অবস্থা তাদের জানার উপায় ছিল না। লন্ডনের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলা ও ভারতের ঘটনা প্রবাহের বিপরীতমুখী সংবাদ পরিবেশন করা হতো। উপরন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একজন ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বহু অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কংগ্রেসের সদস্য হওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল কংগ্রেস তথা হিন্দুজাতির সপক্ষে।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে হাউস অব কমন্সে বেশ কিছু সংখ্যক এমন লোক নির্বাচিত হন যাঁরা ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। তাঁরা বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের সাথে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং পার্লামেন্টে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারকে বিব্রত করে তোলেন। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন (William Wedderburn) নামক তাঁদের একজন ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ দলের আর একজন সদস্য, স্যার হেনরী কটন, ভারতীয়দের আশা-আকাংখার প্রতিনিধিত্ব করে গর্ববোধ করেন। এ সমস্ত সদস্যগণ বার বার একথাই বলতে থাকেন যে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হচ্ছে উভয় বাংলাকে এক করে দেয়া। পার্লামেন্টের জনৈক সদস্য লন্ডন থেকে তাঁর জনৈক ভারতীয় বন্ধুর নিকটে লিখিত একপত্রে এতখানি পর্যন্ত বলেন যে, "মর্লী নতি স্বীকার করবে, আন্দোলন করতে থাক।" পত্রখানি বাংলার সংবাদপত্রে স্থান লাভ করে এবং তার ফলে আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হতে থাকে। —(S. M. Mitra, Indian Problems, p 72, Murray, London, 1908; A Hamid : Muslim Separatism in India, p. 66)

শ্রমিক দলের দুজন নেতা, রামজে ম্যাকডোনাল্ড এবং কিয়ার হার্ডি (Keir Hardie) শান্তি মিশনের নামে ভারত সফরে আসেন। ভারতীয় কংগ্রেস তাদের

সফরের কর্মসূচী তৈরী করে সর্বত্র তাদেরকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ম্যাকডোনাল্ড ছয় সপ্তাহ ভ্রমণের পর মন্তব্য করেন যে, বংগ বিভাগ মারাত্মক ভুল হয়েছে। তিনি জনৈক হিন্দুকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাদের কথা মেনে না নিলে শ্রমিক দলের সদস্যগণ মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করবে না। হার্ডি দু'মাস কাল ভারতে অবস্থান করেন। তাঁর সফরসূচি ও বক্তৃতা বিবৃতি কোলকাতার হিন্দু সংবাদপত্র সমূহ ফলাও করে প্রকাশ করতো। তিনি বলেন পূর্ব বাংলার অবস্থা রাশিয়া থেকেও মর্মন্তুদ। এখানে হিন্দুদের উপর চরম নির্যাতন চলছে। তিনি প্রায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেন যে তারা হিন্দু বিধবাদের শ্লীলতাহানি করছে। এতে করে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। তিনি প্রতিটি জনসভায় আন্দোলনকারীদের তুষ্টি সাধনের জন্যে উচ্চস্বরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করেন। কোলকাতার অমৃত বাজার পত্রিকা বলে, "হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্যে ঈশ্বর হার্ডিকে পাঠিয়েছেন।" হার্ডি ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় অভাব অভিযোগের প্রতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ভারতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন লন্ডনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

—(A Hamid : Muslim Separatism in India, 67, The Times, Weekly Edition, London, Oct. 1907, January-April, 1908, December 1910)

লর্ড ম্যাকডোনাল্ড, যিনি চরম মুসলিম বিদ্বেষী বলে পরিচিত ছিলেন, বংগ বিভাগকে পলাশী ক্ষেত্রে ক্লাইভের বিজয়ের পর প্রশাসন ক্ষেত্রে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মারাত্মক ভুল বলে অভিহিত করেন। (Times, Weekly Edition, London, January, 1908, p-IV)

১৯১০ সালের শেষের দিকে বড়োলাট কার্জনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন লর্ড মিন্টো। পরের বছর যুবরাজ জর্জের (পরবর্তীকালে রাজা পঞ্চম জর্জ) ভারত সফরের কথা। বংগভংগের জন্যে বিক্ষুব্ধ হিন্দুগণ যদি তাঁর সফরকালে কোনরূপে অবাঞ্ছিত আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে যুবরাজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং ভারত সরকারেরও দুর্নাম হবে এ আশংকায় লর্ড মিন্টো অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। অতএব তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং গোখলের সাথে সাক্ষাত করে একথাই বুঝাবার চেষ্টা করেন যে বংগভংগের জন্যে তিনি মোটেই

দায়ী নন। তিনি আলাপ আলোচনায় তাঁদেরকে অনেকটা শান্ত করেন। ফলে মিন্টো বিভাগকে পুরাপুরি কার্যকর করার ব্যাপারে ততোটা মনোযোগ দিতে পারেননি। কিন্তু এ সময়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার জন্যে পূর্ব বাংলার গভর্নর ফুলার মোটে দায়ী না হলেও তাঁকেই কেন্দ্র করে বিভাগ বিরোধী আন্দোলন পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ঘটনাটি হলো এই যে, হত্যাকান্ডের অপরাধে নিম্ন আদালত জনৈক উদয় পান্ডেকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। ইংলন্ডে হাউস অব কমন্সে প্রশ্নটি উথাপিত হলে ভারত সচিব এমন জবাব দান করেন যাতে ফুলারের প্রতি দোষারূপ করা হয়। ফুলারকে সমর্থন করারও কেউ থাকে না। এ বিভাগবিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন যোগায়। একটি স্কুলের উত্তেজিত একদল ছাত্র জনৈক ইংরেজ ব্যাংক কর্মচারীকে আক্রমণ করে এবং বিলেতী বস্ত্র বোঝাই একটি গো-গাড়ীর উপর হামলা চালায়। সরকারী নিয়ম নীতি অনুযায়ী স্কুলটিকে অনুমোদিত স্কুলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে ফুলার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটকে অনুরোধ জানান। ভারত সরকার এটাকে অবিবেচনাপ্রসূত মনে করে ফুলারকে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাহার করতে বলেন। এতে করে প্রাদেশিক গভর্নরের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে বলে ফুলার ভারত সরকারের নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানান। অন্যথায় তিনি চাকুরী থেকে ইস্তাফা দেয়ারও হুমকি দেন। বড়োলাট তাঁর কথায় অটল থাকলেন এবং ফুলারকে ইস্তাফা দিতে হলো। বড়োলাট সংগে সংগেই তাঁর ইস্তাফা মঞ্জুর করলেন। এভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ফুলারের অপসারণে অবস্থার কোনই উন্নতি হলো না। আন্দোলন শতগুণে বর্ধিত হলো। ফুলারের অপসারণ বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোগের ন্যায় কাজ করলো। বিভাগ বিরোধী আন্দোলনকারীগণ যেন নতুন উৎসাহ, উদ্যম ও প্রেরণা লাভ করলো। বলতে গেলে আন্দোলনকারীদের সাদা চামড়ার মুরব্বীগণ লন্ডন থেকেই যুদ্ধের নাকাড়া বাজাচ্ছিলেন। ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের বন্ধুমহল ত আছেই, ১৯০৫ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বেশ কিছু সংখ্যক সদস্যও আছেন এবং তাদের সংগে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে যোগ দিলেন ভারত সচিব মোর্লি। বংগভংগ রদের জন্যে ভারতের হিন্দুদেরকে তাঁরা নাচাতে শুরু করলেন।

উল্লেখ্য যে ১৮৮৫ সালে জনৈক ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫ সালের পূর্বে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেনি। 'স্বরাজের' কথাও তাদের মনের কোণে স্থান পায়নি কোন দিন। দয়ানন্দ

সরস্বতীর 'আর্য সমাজ', রাজা রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি কখনো। বরঞ্চ বাংলার হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে বলা হতো, "আমরা পরমেশ্বরের সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি, পুরুষানুক্রমে যেন ইংরেজাধিকারে থাকিতে পারি। ভারত ভূমি কত পুণ্য করিয়াছিল এই কারণে ইংরেজ স্বামী পাইয়াছে।" -সংবাদ ভাস্কর ২০শে জুন, ১৮৫৭, কলিকাতা- Society for Pakistan Studies প্রকাশিত 'সিপাহী বিপ্লব ও বাঙালী হিন্দু সমাজ' এর সৌজন্যে)।

১৯০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু সমাজ ইংরেজদের প্রতি এরূপ মনোভাবই পোষণ করে আসতো। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বাংলা তথা ভারতের মুসলমানগণ ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল। কিন্তু বংগভংগের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নের কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল বলে হিন্দু সমাজ ঈর্ষায় ফেটে পড়লো। বংগভংগ রদ করার তীব্র আন্দোলনে মেতে উঠলো হিন্দুবাংলা। Glimpses of old Dhaka গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "This Sinister movement was sponsored and conducted by Babus Surendra Nath Banarjee (afterwards knighted) and Bepin Chandra Pal, leader and demagogue of Hindu youths. They started boycotting and burning British made goods on account of which the mills of Lancashire were affected. The terrorists and their secret organisations began to harass the English people by the use of bomb and revolver. This educated gangster started committing dacoities in order to create a sense of insecurity in the country (Glimpses of old Dhaka, p/XXVII).

"এ অশুভ আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিলেন হিন্দু যুব সম্প্রদায়ের নেতা বাবু সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি (পরবর্তীকালে নাইট খেতাবপ্রাপ্ত) এবং বাবু বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁরা বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জন ও জ্বালিয়ে দেয়ার কাজও শুরু করেন যার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের কলকারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সন্ত্রাসবাদীরা এবং তাদের গোপন সংস্থাগুলি বোমা ও রিভলভারের আক্রমণে

ইংরেজদেরকে ব্যতিব্যস্ত করা শুরু করলো। তাদের শিক্ষিত গুন্ডাবাহিনী দেশের মধ্যে নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে দস্যুবৃত্তিও শুরু করে দিল।"

অন্যতম সন্ত্রাসবাদী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ লন্ডন থেকে কোলকাতায় এলেন ১৯০৪ সালে যখন বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা পাকাপোক্ত হয়েছিল। পরের বৎসর এলেন তাঁর ভাই অরবিন্দ। 'বংগমাতার' অংগচ্ছেদ বলে বংগভংগের ধর্মীয় রূপ দেয়া হলো। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মেতে উঠলো সমগ্র হিন্দুবাংলা।

সারা ভারতের হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ শতগুণে বর্ধিত হলো আরও দুটি কারণে। এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে কথা বলার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। বাংলা বিভাগ বিরোধী আন্দোলন ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিল। এ বৎসরেই ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে নেতৃস্থানীয় ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল বড়োলাটের সাথে সাক্ষাত করে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের দাবী জানান। বড়োলাট সম্মত হন এবং তারপরও বহু চাপ সৃষ্টির ফলে এবং সৈয়দ আমীর আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগ' এবং মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা—এ দুটি বস্তু সারা হিন্দুভারতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে সন্ত্রাসবাদ ও 'স্বরাজ' আন্দোলন একসাথেই সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের প্রথম লক্ষ্য হলো বংগভংগ বানচাল করা। দ্বিখন্ডিত 'বাংলা মা'কে পুনর্জীবিত ও সন্তুষ্ট করার জন্যে মানুষের রক্তে হোলিখেলা শুরু হলো। পুলিন দাস ও প্রতুল গাঙ্গুলি পূর্ববংগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। যুবকদেরকে বোমা তৈরী ও অন্যান্য মারণাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। বোমা বিস্ফোরণে সরকারী অফিস আদালত ধ্বংস করা, সভা সমিতি বানচাল করা, খুন জখম, লুটতরাজ প্রভৃতি চলতে থাকলো পূর্ণ উদ্যমে। মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম ও বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকান্ডে আত্মনিয়োগ করলো। বিভাগ বিরোধী আন্দোলন কেউ সমর্থন না করলে তার আর রক্ষা ছিল না। গুন্ডামী ও হত্যাকান্ডের সমালোচনা করলেও তার মুন্ডপাত করা হতো। এসব কারণে জনৈক হিন্দু সরকারী উকিলকে ১৯০৯ সালে গুলী করে হত্যা করা হয়। ১৯১০ সালে ডি এস পি শামসুল আলমকেও হত্যা করা হয়। বাংলার লেফটন্যান্ট্

গভর্নরকে চার বার আক্রমণ করা হয়। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেনের উপর হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়।

বংগভংগ সমর্থনকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে এসব সন্ত্রাসবাদীরা ছিল খড়গহস্ত। আবার নিরীহ ও সরলপ্রকৃতির কিছু মুসলমানদেরকে বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে ভিড়াবার জন্যে হিন্দুগণ অন্যপথ অবলম্বন করলো। 'বংগভংগের ইতিকথায়' ইবনে রায়হান বলেনঃ

হিন্দু মেয়েরা মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হিন্দু মুসলিম দুটি প্রাণ তথা দুই বাংলার মিলনের প্রতীক রাখী বন্ধনী পরিয়ে দিত মুসলমানদের হাতে, তাদের হৃদয় মন জয় করার জন্যে চারদিক হতে ভেসে আসতো সুললিত কণ্ঠের সুমধুর সুর—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল।
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক
হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।

—(বংগভংগের ইতিকথা, ইবনে রায়হান, পৃঃ১০-১১)

নারী কণ্ঠের এ মনমাতানো উদাত্ত আহবানে কিছু মুসলমান বিভ্রান্ত হলো। তাদের মধ্যে ছিলো ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী সাবেক ব্যারিস্টার আবদুল রসূল। তাঁর কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এসব আত্মপ্রবঞ্চিত মুসলমানদের ভুল ভেঙে গেল যখন তারা দেখলো সন্ত্রাসবাদীদের সাহিত্য ও প্রচার পুস্তিকাসমূহ— যা ভরপুর ছিল হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের উদাত্ত আহবানে। এর পুরোভাবে ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণগণ এবং হত্যাকান্ড চালাবার জন্যে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গোপন সংস্থা ও দল। হিন্দু দেবতার নামে এসব হত্যাকান্ড উৎসর্গীকৃত করা হতো। এ কাজ করা হতো গঙ্গাজল স্পর্শ করে বিশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করা হলো এভাবে যে 'ভগবৎগীতায়' আছে, হিন্দুত্ব রক্ষার্থে নরহত্যা দূষণীয় নয়; বরঞ্চ পুণ্য কাজ। 'স্বদেশী'

আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করা হতো কালীমন্দির প্রাংগণে। এভাবে এ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চারিত হতো হিন্দু ধর্মের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে। এসব লক্ষ্য করার পর কোন মুসলমানের পক্ষেই এ আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। (A. Hamid : Muslim Separatism in India. p. 60)

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নরহত্যা শুধু যে বৈধ তা নয়, বরঞ্চ তা অপরিহার্য। আমরা বঙ্কিমের কপালকুন্ডলায় দেখতে পাই কিভাবে হিন্দুতান্ত্রিক কাপালিক নরমাংস দ্বারা ভৈরবীপূজা করে তার ধর্ম পালন করতো। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে দু একটি বাক্য এখানে উধৃত করছি ঃ

"গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নব কুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন, এমন সময় তীরে তুল্যবেগে পূর্বদৃষ্টা রমনী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল; গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, এখনো পালাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?

—নব কুমারের বলপ্রয়োগ দেখিয়া কাপালিক কহিল, 'মূর্খ! কি জন্য বল প্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিন্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

—(বঙ্কিমের কপাল কুন্ডলা ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'কাপালিক সঙ্গে'-হতে গৃহীত)

অতএব যে সন্ত্রাসবাদ ও হত্যাকান্ডকে ধর্মীয় রূপ দেয়া হয়েছিল, হিন্দুধর্মীয় রূপ—তার সাথে মুসলমানদের সংশ্রব-সম্বন্ধ থাকতে পারেনা। আর থাকতে পারে না বলেই এ সন্ত্রাসবাদ ও হত্যাকান্ডের শিকার মুসলমানরাও হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদ, নাগরিকদের বিশেষ করে ইংরেজদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা যতোটা ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল, সম্ভবত তার চেয়ে অধিক বিব্রত করেছিল—বিলাতী বস্ত্রাদি বর্জন নীতি। মানচেস্টারের কলকারখানাগুলি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। মানচেস্টার চ্যাম্বার অব কমার্সের কাছে হিন্দু বণিক সমিতির পক্ষ থেকে অনবরত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে বলা হচ্ছিল, 'যদি এ দেশে তোমাদের বস্ত্রাদি চালাতে চাও, তবে বংগভংগ রদ করো।'

ভারতীয় কংগ্রেসও ঘোষণা করে যে— বংগভংগ রদের একমাত্র পথ হচ্ছে বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জন। তবে কংগ্রেস একথাও বলে যে এ বর্জন নীতি শুধু বাংলাদেশে সীমিত থাকবে।

একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিভাগবিরোধী আন্দোলনের ধারা ক্রমশঃ অন্য একটি খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। তা হলো এই যে, মুসলমান জাতিকেই একেবারে ভারত ভূমি থেকে নির্মূল করে দেয়া। সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন ১৯১১ সালে ভারতে আগমন করেন তখন বহু হিন্দু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত আবেদনপত্রে বলা হয় যে, বিভিন্ন সংস্কারাদির দ্বারা মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করা হচ্ছে। হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলি বলে যে মুসলমানরা দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক, সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ভানমাত্র, ব্রিটেনের প্রতি তাদের দরদমাত্র নেই, তাদের যোগসাজশ রয়েছে মিশরীয় রাজদ্রোহীদের সাথে —(A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 83)। The Times, London এর সংবাদদাতা স্যার ভ্যালেন্টাইন বলেন যে, তিলক এবং তার ভাবাদর্শে পুনায় প্রতিষ্ঠিত স্কুল, পাঞ্জাব ও বাংলার জাতীয়তাবাদী হিন্দুগণকে প্রায় একথা বলতে শুনা যেতো যে, স্পেন থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে যেমন মুসলমানদেরকে নির্মূল করা হয়েছে, তেমনি ভারত থেকেও তাঁদেরকে নির্মূল করা হবে। বড়োলাট কার্জনের ব্যক্তিগত স্টাফদের সাথে জড়িত স্যার ওয়ালটার লরেন্স ইন্দোরের মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংহ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

"একবার শিমলায় লর্ড কার্জন কর্তৃক আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে প্রদত্ত একটি বিদায়কালীন নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন স্যার প্রতাপ সিংহ। ভোজের পর রাত দুটো পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার বিভিন্ন আলাপ আলোচনা হয়। তিনি তাঁর জীবনের বহু আশা-আকাংখা আমার কাছে ব্যক্ত করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করে আমাদের উভয়েরই কতিপয় মুসলমান বন্ধুর নাম করলাম। তিনি বল্লেন, 'হাঁ, তাদেরকে আমি পছন্দ করি, কিন্তু অধিকতর পছন্দ করি তাদের মৃত্যু।" স্যার লরেন্স বলেন, "স্যার প্রতাপের এ ধরনের আলাপ সম্পর্কে আমি প্রায়ই চিন্তা করি। বহু বৎসর ধরে ভারতীয়দের সাথে কারো পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন হঠাৎ তারা তাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করবে

এবং ভিতরের গোপন রহস্যটি উদঘাটন করে ফেলবে। স্যার প্রতাপ সিংহ একজন ভালো হিন্দু রাজপুত। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। বহু লোকের সাথে মিশেছেন। ভালো ইংরেজী জানেন। বহু জাতির লোকের সাথে তাঁর পরিচয়। বলতে গেলে তিনি একজন বিশ্বজনীন (Cosmopolitan) সভ্যতার ধারক বাহক। কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দুরপনেয় মুসলিম বিদ্বেষ বাসা বেঁধে আছে।"

(Sir Walter Lawrence : The India We Served, p. 209, Cassel London, 1928; A. Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 83-84)

স্যার লরেন্স একটি অতি মোক্ষম সত্য উদঘাটন করেছেন। ভারত ভূমি থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা স্যার প্রতাপ সিংহের মতো কেবলমাত্র দু'একজন হিন্দু ভদ্রলোকের অন্তরের কথাই নয়, বরঞ্চ এ হচ্ছে গোটা হিন্দুজাতিরই অন্তরের কথা। পরবর্তী সময়ে ভারতে পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য বক্তৃতা বিবৃতিতে বার বার উপরোক্ত মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বংগভংগ রদ ও তার প্রতিক্রিয়া

বাংলায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে এ আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ১৯১০ সালের শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে ফিরে আসছিল। আন্দোলনের সিপাহীরা একরকম রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ বৎসরেই জনৈক বাংগালী হিন্দু ব্যবস্থাপক সভায় বিষয়টি নতুন করে উথাপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পরে তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছিলেন আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তিনিও সবশেষে তাঁর 'বাঙালী' পত্রিকার মাধ্যমে বলেন, "আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে এ বিভাগ টিকে থাকার জন্যে হয়েছে এবং আমরা একে বানচাল করতে চাইনা।" (Fraser, India Under Curzon and After, p. 391. A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 86)

কিন্তু সুদূর লন্ডনের বুকে কোন্ গোপন হস্ত বংগবিভাগের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র তৈরী করে চলেছিল তা জানা যায়নি।

রাজা পঞ্চম জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তাঁর আরোহণের কথা আপন মুখে ঘোষণা করার অভিপ্রায়ে ১৯১১ সালে ভারতে আগমন করেন। শুধুমাত্র রাজ্যাভিষেক ঘোষণার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে সুদূরবর্তী উপনিবেশে আগমন করা—এ ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও নজীরবিহীন ঘটনা। সন্ত্রাসবাদীদের অশুভ ষড়যন্ত্রের আশংকা তখনো মন থেকে মুছে ফেলা যায়নি। ভারতে তখন দুর্ভিক্ষ বিরাজমান। ইতালী–তুর্কী যুদ্ধের কারণে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ। এসব কারণে পঞ্চম জর্জের মন্ত্রীমন্ডলী ভারত সফর অবিবেচনা প্রসূত মনে করে তাঁকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেন। রাজা সকল উপদেশ উপেক্ষা করে ভ্রমণের প্রস্তুতি করতে থাকেন। নবেম্বর মাসে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তিনি বোম্বাই অবতরণ করেন। ভারতবাসী অধীর প্রতীক্ষায় রইলো যে কখন কোন শুভ মুহূর্তে সম্রাট ভারতবাসীকে কি কি পুরস্কার বা রোয়েদাদ প্রদানে আপ্যায়িত করেন। সবশেষে

সে মুহূর্ত এসে গেলো। এক অতি জাঁকজমকপূর্ণ সমাবেশে ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজা পঞ্চম জর্জ এক একটি করে তাঁর অপার করুণা প্রিয় প্রজাবৃন্দের উপর বর্ষণ করতে লাগলেন। সকল রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো, শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে একটা মোটা রকমের অংক বরাদ্দ করা হলো; ভারতীয় সৈনিকদের জন্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' সম্মান লাভের অযোগ্যতা দূরীভূত হলো, অল্প বেতনভুক সরকারী কর্মচারীদেরকে অতিরিক্ত অর্ধ মাসের বেতন দেয়া হলো; ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লী স্থানান্তরিত করা হলো। সর্বশেষে বলা হলো "বংগভংগ' রদ করা হলো।" হিন্দুগণ আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়লো। বংগভংগ বাতিলের ঘোষণা দ্বারা তাৎক্ষণিক সুবিধা এই হলো যে, ভারত সাম্রাজ্যের অপরাধ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে রাজদম্পতির নিরাপদ ভ্রমণের নিশ্চয়তা পাওয়া গেল।

কিছুদিন পর যখন রাজা কোলকাতায় এলেন, তখন হিন্দুবাংলা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজা ও ব্রিটিশ সাম্রাজের প্রতি তাদের অদম্য আনুগত্য প্রদর্শন করে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা করে। হিন্দু সংবাদপত্রগুলি রাজার মহানুভবতার জন্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে থাকে। কতিপয় সংবাদপত্র এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় যে, হিন্দু মন্দিরে শ্বেত মহারাজা ও মহারাণীর মূরতি স্থাপনের প্রস্তাব করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং লর্ড হার্ডিঞ্জেরও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

অপরদিকে বিভাগ বাতিল করে মুসলমানদের প্রতি করা হয় চরম বিশ্বাসঘাতকতা। কার্জন বিভাগ সম্পাদন করে এবং হার্ডিঞ্জ তা বাতিল করে। কিন্তু উভয়ের কার্যপ্রণালীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে কার্জন প্রকাশ্যে বংগভংগের প্রস্তাব দেন, তার সপক্ষে ন্যায়সংগত যুক্তি পেশ করেন। এ নিয়ে বহুদিন আলাপ আলোচনা হয়, বহু কাগজ কালি ব্যয় হয়। প্রস্তাবটি যথারীতি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং যথাসময়ে তা কার্যকর করা হয়। পক্ষান্তরে হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনা অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে অগ্রসর হয় এবং জনসাধারণের কাছে তা প্রকাশ লাভ করে অতি আকস্মিকভাবে এবং এক অতি বিস্ময়ের রূপ নিয়ে। ব্রিটিশ সরকারের এ সিদ্ধান্তের দ্বারা একের সর্বনাশ করে অপরের পৌষ মাস এনে দিলেও এর দ্বারা তাদের প্রগল্ভতা, ডিগবাজী ও একটি অনুন্নত অঞ্চলের

সম্প্রদায়ের ন্যায়সংগত অধিকার ফিরে দিয়ে আবার তা কেড়ে নেয়ার অন্যায় অবিচারমূলক মনোবৃত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ব্রিটিশ সরকারের এ হাস্যকর অভিনয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে যতটুকু আভাস পাওয়া যায় তা হলো এই যে, বিভাগ রদের খেয়ালটা তৎকালীন ভারত সচিব 'ক্রু'র (Crew) মস্তিষ্কে স্থান লাভ করেছিল। যারা বিভাগকে মারাত্মক ভুল বলে অভিহিত করে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, তাদেরকে শান্ত করাই ছিল ক্রুর অভিপ্রায়। হার্ডিঞ্জ বলেন, "পরে আমাকে এ কথা জানানো হলো যে, উভয় বাংলায় যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সমস্ত বাংগালী যেটাকে অন্যায় অবিচার মনে করেছে তা দূর করার জন্যে কিছু করা একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য এ সময়ে বিদেশেও এমন আশা করা হচ্ছিল যে এ 'অবিচার' দূর করার জন্যে কিছু করা হবে। আমি অনুভব করলাম যে যদি কিছু করা না হয়, তাহলে অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতে আমাদেরকে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।"

—(Hardinge of Penhurst : My Indian Years, p. 36, Murray London, 1948; A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 88)

উপরে বর্ণিত স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির উক্তিতে বুঝতে পারা যায় যে, বিভাগ বিরোধী আন্দোলনকারীগণ এক রকম হতাশ হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন এবং বিভাগকে মেনে নিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু লন্ডনে যেসব সাদা চামড়ার বন্ধুগণ ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন, তাঁরা হাল ছেড়ে দেননি। তাঁরা তাদের কাজ করেই যাচ্ছিলেন যার দ্বারা ভারত সচিব ক্রু অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আবদুল হামিদ বলেন যে, বিভাগ রদ করার সপক্ষে যত প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, "উভয় বাংলার হিন্দুগণ প্রায় সব ভূসম্পদের মালিক ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী বাকুরীতেও ছিল তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। ফলে তাঁরা জনগণের উপরও অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। তাদের সম্পদ ও সংস্কৃতি তাদেরকে যে প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিল, বংগ বিভাগের ফলে তাঁরা সে প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। কায়েমী স্বার্থ ও শ্রেণীপ্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার সপক্ষে এ যুক্তি বটে।

—(A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 89)

বিভাগ রদ করার পেছনে যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না, বরঞ্চ বলতে গেলে ছিল এক চরম দুরভিসন্ধি, তা উপরের কথায় সুস্পষ্ট হ'য়ে যায়। বংগভংগ রদ ছিল মুসলমানদের উপর এক চরম আঘাত। মুসলমানদের বুঝতে বাকী ছিল না যে সরকার তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদের আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে। এ সম্পর্কে মুশতাক হোসেন তাঁর এক নিবন্ধে বলেন,

"মুসলমানরা এ পদক্ষেপকে (উভয় বাংলার একত্রীকরণ) অবজ্ঞার চোখেই দেখবে। ব্রিটিশ মন্ত্রীমন্ডলী কার্জনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর উভয় বাংলার একত্রীকরণ এটাই প্রমাণ করে যে কর্তৃপক্ষ পংগু হয়ে পড়েছেন। ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর কেউ আস্থা পোষণ করতে পারবে না। ··· আমরা এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কোন আন্দোলন করব না। কিন্তু আমাদের দাবী এই যে বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ যেসব সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল, তা যেকোন ভাবে তাদের জন্যে সুনিশ্চিত করতে হবে। ··· ত্রিপলী ও পারস্যের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতি মুসলমানদেরকে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছিয়ে দিয়েছে। ··· এই সর্বশেষ আঘাত আমাদের হতাশা ও নৈরাশ্য বাড়িয়ে দিয়েছে। ··· এই কঠোর পদক্ষেপ আমাদের জাতির মনে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে। তারা ভাবতে শুরু করেছে যে কংগ্রেস থেকে সরে থেকে বিশেষ লাভ হয়নি। কেউ বা হয়তো মুসলিম লীগ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করবে। এতদিন ধরে ঠিক এইটাই কংগ্রেস প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু আমরা এরূপ চিন্তাধারার সাথে একমত নই। আমরা আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বিসর্জন দিয়ে একটি শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারি না। এ হচ্ছে আত্মহত্যার পথ। একটি স্রোতস্বিনী সমুদ্রে মিলিত হওয়ার পর তার সত্তা হারিয়ে ফেলে। সরকারের প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে আমরা কংগ্রেসের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নই। আনুগত্যই আমাদের আসল উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। আনুগত্য সর্বদাই শর্তসাপেক্ষ। আনুগত্য অসম্ভব রকমের চাপ সহ্য করতে পারে না।

··· এ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, মুসলমানগণ সরকারের প্রতি আর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। আমাদের নির্ভর করতে হবে খোদার উপরে এবং আমাদের চেষ্টাচরিত্রের উপরে। ··· এদিক দিয়ে যদি আমরা সুসংবদ্ধ হতে

পারি তাহলে সরকার আমাদের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবেন। যা কিছু ঘটেছে তার থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

··· আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা সরকার অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। রাজার পক্ষ থেকে ঘোষণাটি যেন একটি গোলন্দাজ বাহিনীর ন্যায় মুসলমানদের শবদেহকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করে গেল।"

—(Zuberi : Tazkira Waqar, pp. 228-40; A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 91)

১৯১২ সালে মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে বংগভংগ সংগ্রামের আহত সৈনিক খাজা সলিমুল্লাহ বলেন ঃ

বংগভংগের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেমে যাওয়ার পর প্রসংগটি পুনরায় উথাপনের কোন ন্যায়সংগত কারণ কোন দায়িত্বশীল বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি আবিষ্কার করতে পারেনি। এ বিভাগ ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়ে ১৯১১ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুসলমানদের আশা আকাংখার সম্ভাবনা দেখে আমাদের শত্রুগণ ব্যথিত হয়ে পড়লেন। প্রকৃত পক্ষে বিভাগের ফলে আমরা তেমন বিশেষ কিছুই লাভ করিনি। যতটুকুই লাভ করেছিলাম আমাদের প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায় স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন সৃষ্টি করে তাও আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নিল। হত্যা ও দস্যুবৃত্তি করে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করলো, তারা বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জন করলো। সরকার এতে কিছুই মনে করলেন না। এসব হত্যাকান্ডে মুসলমানগণ অংশগ্রহণ না করে সরকারের প্রতি অনুগতই রইলো। ··· বিভাগের ফলে মুসলমান কৃষককুল লাভবান হলো। হিন্দু জমিদারগণ তাদেরকে আন্দোলনে টেনে নামাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা কর্ণপাত করলো না। এতে করে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হলো। সরকার দমননীতি অবলম্বন করলেন। তাতে ফলোদয় হলো না। একদিকে ছিল সম্পদশালী বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায় এবং অপরদিকে দরিদ্র মুসলমান এবং এরা ছিল সরকারের সাথে। এভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হলো। আকস্মিকভাবে সরকার বিভাগ রদ করে দিলেন। এ বিষয়ে আমাদের সাথে কোন আলাপ আলোচনাও করা হলো না। (Ahmad, Ruh-i-Raushan Mustaqbil, pp. 58-59; A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 92)

বিভাগ রদ করার পেছনে যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না, বরঞ্চ বলতে গেলে ছিল এক চরম দুরভিসন্ধি, তা উপরের কথায় সুস্পষ্ট হ'য়ে যায়। বংগভংগ রদ ছিল মুসলমানদের উপর এক চরম আঘাত। মুসলমানদের বুঝতে বাকী ছিল না যে সরকার তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদের আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে। এ সম্পর্কে মুশতাক হোসেন তাঁর এক নিবন্ধে বলেন,

"মুসলমানরা এ পদক্ষেপকে (উভয় বাংলার একত্রীকরণ) অবজ্ঞার চোখেই দেখবে। ব্রিটিশ মন্ত্রীমন্ডলী কার্জনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর উভয় বাংলার একত্রীকরণ এটাই প্রমাণ করে যে কর্তৃপক্ষ পংগু হয়ে পড়েছেন। ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর কেউ আস্থা পোষণ করতে পারবে না। ··· আমরা এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কোন আন্দোলন করব না। কিন্তু আমাদের দাবী এই যে বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ যেসব সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল, তা যেকোন ভাবে তাদের জন্যে সুনিশ্চিত করতে হবে। ··· ত্রিপলী ও পারস্যের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতি মুসলমানদেরকে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছিয়ে দিয়েছে। ··· এই সর্বশেষ আঘাত আমাদের হতাশা ও নৈরাশ্য বাড়িয়ে দিয়েছে। ··· এই কঠোর পদক্ষেপ আমাদের জাতির মনে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে। তারা ভাবতে শুরু করেছে যে কংগ্রেস থেকে সরে থেকে বিশেষ লাভ হয়নি। কেউ বা হয়তো মুসলিম লীগ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করবে। এতদিন ধরে ঠিক এইটাই কংগ্রেস প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু আমরা এরূপ চিন্তাধারার সাথে একমত নই। আমরা আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বিসর্জন দিয়ে একটি শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারি না। এ হচ্ছে আত্মহত্যার পথ। একটি স্রোতস্বিনী সমুদ্রে মিলিত হওয়ার পর তার সত্তা হারিয়ে ফেলে। সরকারের প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে আমরা কংগ্রেসের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নই। আনুগত্যই আমাদের আসল উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। আনুগত্য সর্বদাই শর্তসাপেক্ষ। আনুগত্য অসম্ভব রকমের চাপ সহ্য করতে পারে না।

··· এ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, মুসলমানগণ সরকারের প্রতি আর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। আমাদের নির্ভর করতে হবে খোদার উপরে এবং আমাদের চেষ্টাচরিত্রের উপরে। ··· এদিক দিয়ে যদি আমরা সুসংবদ্ধ হতে

পারি তাহলে সরকার আমাদের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবেন। যা কিছু ঘটেছে তার থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

··· আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা সরকার অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। রাজার পক্ষ থেকে ঘোষণাটি যেন একটি গোলন্দাজ বাহিনীর ন্যায় মুসলমানদের শবদেহকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করে গেল।"

—(Zuberi : Tazkira Waqar, pp. 228-40; A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 91)

১৯১২ সালে মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে বংগভংগ সংগ্রামের আহত সৈনিক খাজা সলিমুল্লাহ বলেন ঃ

বংগভংগের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেমে যাওয়ার পর প্রসংগটি পুনরায় উত্থাপনের কোন ন্যায়সংগত কারণ কোন দায়িত্বশীল বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি আবিষ্কার করতে পারেনি। এ বিভাগ ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়ে ১৯১১ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুসলমানদের আশা আকাংখার সম্ভাবনা দেখে আমাদের শত্রুগণ ব্যথিত হয়ে পড়লেন। প্রকৃত পক্ষে বিভাগের ফলে আমরা তেমন বিশেষ কিছুই লাভ করিনি। যতটুকুই লাভ করেছিলাম আমাদের প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায় স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন সৃষ্টি করে তাও আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নিল। হত্যা ও দস্যুবৃত্তি করে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করলো, তারা বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জন করলো। সরকার এতে কিছুই মনে করলেন না। এসব হত্যাকান্ডে মুসলমানগণ অংশগ্রহণ না করে সরকারের প্রতি অনুগতই রইলো। ··· বিভাগের ফলে মুসলমান কৃষককুল লাভবান হলো। হিন্দু জমিদারগণ তাদেরকে আন্দোলনে টেনে নামাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা কর্ণপাত করলো না। এতে করে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হলো। সরকার দমননীতি অবলম্বন করলেন। তাতে ফলোদয় হলো না। একদিকে ছিল সম্পদশালী বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায় এবং অপরদিকে দরিদ্র মুসলমান এবং এরা ছিল সরকারের সাথে। এভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হলো। আকস্মিকভাবে সরকার বিভাগ রদ করে দিলেন। এ বিষয়ে আমাদের সাথে কোন আলাপ আলোচনাও করা হলো না। (Ahmad, Ruh-i-Raushan Mustaqbil, pp. 58-59; A. Hamid : Muslim Separatism in India, p. 92)

১৯২৩ সালে কোকোনাদায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী তাঁর সভাপতির ভাষণে বংগভংগ রদের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন ঃ "আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ তাদের সদ্যলব্ধ অধিকার সমূহ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হলো এবং (সরকারের প্রতি) সন্তোষ প্রকাশকে চরম অপরাধ বলে শাস্তি দেয়া হলো। এ এমন এক ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত যা ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে।"

—(Iqbal : Select Writings & Speeches, p. 162)

ব্রিটিশ সরকার যে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, ডিগবাজী খেয়েছিলেন, মুসলমানদের প্রতি যে চরম অন্যায় করা হয়েছিল এবং এক শ্রেণীর সন্ত্রাস ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যে তাঁদের চির গর্বিত মস্তক অবনত হয়েছিল, এ অনুভূতি তাঁদের অনেকেরই মধ্যে এসেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত দীর্ঘ দিনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তকে সাত বৎসর পর রাজা পঞ্চম জর্জের মুখের ঘোষণা দ্বারা পরিবর্তিত করে দুনিয়ার সামনে তাঁদের মর্যাদা যে ক্ষুণ্ন হয়েছিল এ অনুভূতিও তাঁদের ছিল। তাই অনেকে বংগভংগের কার্যকারণের ইতিহাসকে বিকৃত করে রাজা পঞ্চম জর্জের মন রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

অবশেষে পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এবং বংগভংগ রদের দরুন তাদের যে বিপুল ক্ষতি হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকার করেন যাতে করে এ অঞ্চলের অনুন্নত লোকদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। দুই বাংলার একত্রীকরণে বাংলার হিন্দুগণ আনন্দে গদগদ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মুসলমানদের কোন প্রকার উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধি তারা বরদাশত করতে কিছুতেই রাজী ছিল না। তাই সরকার কর্তৃক ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তে তাদের মাথায় যেন আবার বজ্রাঘাত হলো। কতিপয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অগ্নিশর্মা হয়ে এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। যেহেতু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হিন্দু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রভাবের মূল উৎসকেন্দ্র, সেজন্য আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হলে প্রথমটির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে বলেও তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অবিলম্বে বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করে। তাঁরা বলেন যে, প্রদেশে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে জাতীয় জীবনের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন

অধিবাসীদের মধ্যে বিরাজমান অনৈক্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে। তাঁরা বড়োলাটকে এ বিষয়েও সাবধান করে দেন যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হবে অত্যন্ত নগণ্য ও হাস্যকর। কারণ, তাঁদের মতে, যথেষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর অভাব হবে এবং মূলতঃ মুসলমান কৃষিজীবীদের জন্যে প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের কোন মূল্য হবে বলেও তাঁদের সন্দেহ আছে।

—(Govt. of India, Speeches by Lord Hardinge of Penhurst, Vol. 1, pp. 203-20, Calcutta, 1916)

এ সম্পর্কে বাংলার মুসলিম জননেতা মরহুম এ কে ফজলুল হক বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯১৩–১৪ সালের বাজেট অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে তার কিঞ্চিত উদ্ধৃত করলাম। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন ঃ

"ভারত সরকারের ২৫শে আগস্টের প্রতিবেদনে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, বংগভংগ রদের দরুন যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার দ্বারা মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না, তারপর আঠার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল এবং এখন দেখার সময় এসেছে তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি কতখানি পালন করেন। দিল্লী দরবারের ঘোষণার অল্পদিন পর মহামান্য বড়োলাট যখন ঢাকায় পদার্পণ করেন, তখন প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে, মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি কোন একটা ঘোষণা করবেন। অবশ্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলব যে আমরা যা আশা করেছিলাম, সেদিক দিয়ে এ অতি তুচ্ছ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বকে ছোট করতে চাই না। কারণ, পূর্ব বাংলার শিক্ষার উন্নয়নে যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল, তা এর দ্বারা বিদূরিত হবে। একটি মুসলিম অধ্যুষিত কেন্দ্রে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অশেষ সুযোগ সুবিধার কথাও অস্বীকার করিনা। কিন্তু এই যে বলা হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু মুসলমানদের উপকারার্থে করা হচ্ছে অথবা এটা হচ্ছে মুসলমানদেরকে খুশী করার একটা বিশিষ্ট পদক্ষেপ— আমি এসবের প্রতিবাদ করছি। বড়োলাট সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জন্যে এবং তাই হওয়া উচিত।' এ সংকুচিত করা হয়েছে এই ভয়ে যে হিন্দুদের মধ্যে আবার বংগভংগের প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হতে পারে। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরিকল্পিত একটি মুসলিম কলেজ এবং ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক স্টাডিজ্—

এটাকে মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করার অভিপ্রায় বলেও ধরা যেতে পারে না। কারণ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবত ষোল আনা শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি সহ সরকার কোলকাতায় একটি একচেটিয়া হিন্দু-কলেজ চালিয়ে আসছেন এবং ঢাকায় একটি মুসলিম কলেজ হলে তা হবে মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের অবহেলিত দাবীর দীর্ঘসূত্রী স্বীকৃতি। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সম্পর্কে কথা এই যে, যে অঞ্চলে মুসলমানগণ দীর্ঘকাল যাবত আরবী ও ফার্সী শিক্ষার বাসনা পোষণ করে আসছে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের শুধু স্বাভাবিক ফল মাত্র এই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। এটা সকলের জানা না থাকতে পারে যে, পূর্ব বাংলার জেলাগুলি থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্র বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতে পড়াশুনা করে এবং এই শ্রেণীর অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের কোন ব্যবস্থা ব্যতীত একটি বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই ন্যায়সংগত হতোনা। আমি আশা করি সরকারী কর্মকর্তাগণ এ কথা উপলব্ধি করবেন যে, যদিও মুসলমানগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই রায় দিয়েছে, কিন্তু এটাকে, এমনকি একটি মুসলিম কলেজ এবং ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক স্টাডিজকেও তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ বলে তারা মনে করে না।

—(Bangladesh Historical Studies : Speech on the Budget for 1913-14, pp.149-50)

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বংগভংগ, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তথা মুসলমানদের কোন সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে হিন্দু ভারত ও ইংরেজদের মানসিকতা ও আচরণ কি ছিল।

বংগভংগ ও বংগভংগ রদের ফলে মুসলমানরা কি লাভ করলো আর কি হারালো তাই আমাদের যাচাই পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে ভারতের ব্রিটিশ আমলাগণ বহু দিন যাবত কতিপয় প্রাদেশিক এলাকার পুনর্বন্টন ও পুনর্বিন্যাসের চিন্তাভাবনা করছিলেন এবং এ বিষয়ে সেক্রেটারিয়েটে ফাইলের পর ফাইল তৈরী হয়েছিল। লর্ড কার্জন এসবকে ভিত্তি করে সর্ববৃহৎ প্রদেশ বাংলাকে বিভক্ত করে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। বাংলার মুসলমানদের এ বিষয়ে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না। অবশ্য বিভাগের ফলে মুসলিম অধ্যুষিত

পূর্ববাংলার মুসলমানদের সর্ববিধ মংগল ও উন্নতির আশা পরিলক্ষিত হলো। বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধায় নিছক ঈর্ষান্বিত হয়ে বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। সে আন্দোলন পরে সন্ত্রাসবাদ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের রূপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু মানসিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ভারতভূমিতে মুসলমানগণ তাদের অস্তিত্ব, তাহজিব তামাদ্দুন, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বিপন্ন মনে করে। আত্মরক্ষার জন্যে 'মুসলিম লীগ' নামে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। ভারতের হিন্দু মুসলিম মিলে একজাতীয়তার ছদ্মনামে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে তাদেরকে হিন্দুজাতীয়তার মধ্যে একাকার করার ষড়যন্ত্রও মুসলমানরা উপলব্ধি করে। আগা খানের নেতৃত্বে ৩৬ জন বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল বড়োলাটকে তাঁদের এ আশংকা ব্যাখ্যা করে পৃথক নির্বাচন প্রথা দাবী করেন। পরে ব্রিটিশ সরকারও এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করেন। মুসলমানগণ একটি পৃথক জাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ— ভারত বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লাভ হয়।